সমুদ্র পেরিয়ে

প্রতিভা বসু

লেখাপড়া । কলকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ : কার্তিক ১৩৫৭

প্রকাশক : রাখাল সেন

লেখাপড়া : ১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-১২

মুদ্রাকর : পরাণচন্দ্র ঘোষ

পরাণ প্রেস : ৯৯এ, তারক প্রামাণিক রোড, কলকাতা-৬

প্রচ্ছদশিল্পী : পূর্ণেন্দু পত্রী

সাহিত্যিক সন্তোষকুমার ঘোষ
অনেক কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসার সঙ্গে
প্রতিভা বসু

আমাদের প্রকাশিত এই লেখিকার বই

সোনালি বিকেল

সমুদ্র হৃদয়

১

খুঁজে খুঁজে ভরতপুরে চ'লে এলেন হৃষীকেশ। হৃষীকেশ তালুকদার, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো এক বিভাগের প্রধান। বয়েস উনচল্লিশ, চেহারা সুকুমার, বিদেশে থাকাকালীন একজন শ্বেতাঙ্গ রমণীকে বিবাহ করেছিলেন, বছর দু'য়ের মধ্যেই ছাড়াছাড়ি হ'য়ে গেছে, একটি মেয়ে আছে, মেয়েটিকে তিনি নিজের কাছে রেখেছেন। দেশে ফেরার সময় সঙ্গে ক'রে এনেছিলেন। মেয়েটির মা বিচ্ছেদের অল্পকালের মধ্যেই দেশজ একটি পুরুষকে ভালোবেসে বিয়ে ক'রে আরো দু'টি সন্তানের জননী হয়েছেন। হয়তো সেইজন্যই ভারতীয় স্বামীর ঔরসজাত কালো চুল কালো চোখের সন্তানটির জন্য ততোটা অধীর নন। প্রাক্তন স্বামীর এই হঠকারীতায় অন্তত কিছু ঝঞ্ঝাট করেননি। দেশে ফেরার সময় হৃষীকেশ মেয়ের মাকে কিছু না জানিয়েই মেয়েকে নিয়ে এসেছিলেন, তখন মেয়ের বয়েস ছিলো পাঁচ বছর তিন মাস। এখন সেই মেয়ে ন' বছরের বালিকা, চেহারায় মায়ের রং মায়ের ছাঁদ কিছুটা থাকলেও পুরোপুরি বাঙালী। এই বাঙালিয়ানা তার বাবার বৈশিষ্ট্য, নিজের দেশ, ধর্ম এবং ভাষা — সব কিছুর প্রতিই হৃষীকেশের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা। মেয়েও তার দ্বারা প্রভাবিত। হৃষীকেশ একান্ত ভাবেই পড়াশুনোর মানুষ। বস্তুতই বিদগ্ধ ব্যক্তি। একজন বিশিষ্ট প্রবন্ধকারও বটে।

মেয়ের জন্য বরাবরই একজন গৃহশিক্ষিকা রাখেন তিনি। উপায় নেই। তিনি যখন কাজে বেরোন, তখন কে দেখে মেয়েকে? পুরোনো আয়া আছে বটে, কিন্তু একজন শিক্ষিত মহিলার সংস্পর্শও থাকা দরকার, যিনি তাকে লেখাবেন, পড়াবেন, ভব্যতায় হাতে খড়ি দেবেন,

স্নেহ করবেন, সেজন্য সম্মান মূল্য যথেষ্ট দিতে তিনি উদার। কাগজে বিজ্ঞাপন দিলে অনেকেই আসেন সাক্ষাৎ করতে, অর্থাৎ ইন্টারভিউ দিতে, কিন্তু তিনি অনেক খুঁত খুঁত ক'রে, অনেক চিন্তা ক'রে তবে নিয়োগ করেন। তিনি রুচিবান, সাহিত্য বোঝেন, ছবি বোঝেন। সেই সব দিকে দৃষ্টি রেখেই নির্বাচন করেন। পাঁচ থেকে নয়, এই চার বছরে তিনজন এসেছে গিয়েছে, এখন খুঁজে খুঁজে যার বাড়িতে এলেন তিনি চতুর্থ। মাস আটেক হ'লো যোগ দিয়েছেন কাজে। দুপুর বারোটা থেকে রাত ন'টা পর্যন্ত ডিউটি। আট মাসের মধ্যে সাত মাস পর্যন্ত একদিনের জন্যও কামাই করেননি, এই মাসে আজ আসছেন তো কাল আসছেন না, কাল আসছেন তো আবার দু'দিন চুপ, হৃষীকেশ বিরক্ত হচ্ছেন, ভ্রূকুটি করছেন, ক্রুট করছেন মনে মনে, এখন চ'লে এসেছেন খোঁজ করতে।

আজ শনিবার, তাঁর অফ ডে। ভেবেছিলেন, মেয়েকে নিয়ে কল্যাণীতে যাবেন, ছোট্ট একটা বাড়ি করেছেন সেখানে, জমিতে বাগান করেছেন মালি রেখে, মাঝে মাঝে সপ্তাহান্তে এমনি যান, শনি-রবি থেকে সোমবার অতি প্রত্যুষে চ'লে আসেন। গাড়ি আছে, বেশী অসুবিধে হয় না। ফিরে মেয়ে ইশকুলে যায়, তিনি কলেজে যান। পুরোনো গৃহসেবক হরিচরণ প্রধান হাট বাজার রান্না পোষাক সব ঠিক ক'রে রাখে। আজ তা হ'লো না।

হৃষীকেশের জীবনযাত্রা খুব নিয়মিত। নিয়মের ব্যতিক্রম হ'লে তাঁর মেজাজ বিগড়ে যায়, দিনটাই নষ্ট মনে হয়। উত্তরবঙ্গের কোনো স্থানে পিতামাতা আছেন, তাঁদের জমি জায়গাও আছে, পিতা সেখানকার ইশকুল শিক্ষক, মাতা সমাজ সেবিকা। তাঁদের জীবনও নির্বিঘ্ন। এই ছেলে হৃষীকেশ, আর একটি কন্যা। কন্যা বিবাহিত, দু'টি শিশুর মা এবং জামাতা অতুলনীয় সজ্জন। ভালো চাকরি করে, থাকে কানপুরে। ছেলে মেয়ে দু'জনেই ছুটি-ছাটায় আসে থাকে চ'লে যায়। মাসে মাসে তাঁরাও যান।

হৃষীকেশকে তাঁর মা পুনরায় বিবাহ করবার জন্য কিছুটা আগ্রহ দেখিয়েছিলেন, হৃষীকেশ কানে তোলেননি, তোলার প্রশ্ন আছে ব'লেও মনে করেননি কেননা তাঁর কোনো অভাব বোধ নেই স্ত্রীর জন্য। মা অবশ্য যুক্তি-তর্কের জাল বিস্তার করেছেন অনেক, একটি মেয়েকে মনোনীত ক'রে তার সপক্ষে অনেক ওকালতি করেছেন, ফল হয়নি কিছু। আসলে প্রেম বিষয়ে তিনি উদ্যমশীল নন, পারঙ্গমও নন। সেই বিদেশ বাসকালে কী ক'রে ডরোথীকে বিয়ে ক'রে ফেলেছিলেন, মাঝে মাঝে ভাবেন সে কথা। ঐ ক্ষণস্থায়ী প্রেমের কথা মনে হ'লে ভুরু কুঁচকে উচ্চারণ করেন, 'ইজ এ্যান এ্যাকসিডেন্ট।' হৃদয়ে প্রেমের চেয়ে তাঁর স্নেহ বেশী, মেয়েকে নিয়ে তিনি তাঁর ধারণায় বেশ সুখে আছেন।

মাঝে মাঝে এই সব উৎপাতই যা অনর্থ করে। মহিলা ছিলেন ভালো, কামাই করার যে কী দরকার কে জানে। মাইনে নেবার বেলায় তো কার্পণ্য নেই, মাইনে কাটলে তবে ঠিক হয়। চট ক'রে জবাব দিতে লজ্জা করে তাই, নইলে কবে জবাব দিয়ে দিতেন। তাছাড়া মুনমুন অর্থাৎ তাঁর মেয়ে এই আট মাসে মহিলাটিকে খুব ভালোবেসেছে উপরন্তু দেখে শুনে মনে হয় মানুষটি যাকে বলে অনেষ্ট ঠিক তাই।

অবশ্য তাঁর সঙ্গে আর কতোটুকু বা দেখা হয়। ক্বচিৎ কদাচ। 'এই যে —' 'কেমন আছেন' 'ছাত্রীটি কথা-বার্তা শুনছে তো?' এটুকুই সম্ভাষণ। কেননা মহিলাটি যতোক্ষণে আসেন তাঁর ততোক্ষণে কলেজে যাবার সময় হ'য়ে যায়। আর মেয়ে প্রাতঃকালীন ইশকুল সেরে বাড়ি ফেরে। উনিও মেয়েকে নিয়ে ব্যস্ত হ'য়ে পড়েন, তিনিও ব্যস্ত হন পড়াতে যাবার আয়োজনে। বিকেলের 'চা'টা অবশ্য এক-সঙ্গে এক টেবিলে বসেই খাওয়া হয় ফিরে এলে। তারপর আবার যার যার কাজে তার তার ডুবে যাওয়া। সন্ধেবেলা মেয়েকে গানও শেখান তিনি। গান বিষয়ে হৃষীকেশের কান ততো দুরস্ত নয়, দাঁড়ানো আলোর তলায় এলানো চেয়ারে ব'সে ব'সে নিরব পঠন পাঠনেই এই

সময়ে অভ্যস্ত, নয়তো আড্ডা ; এই গানের উৎপাত নতুন। পড়ায় ব্যাঘাত ঘটে। পৃষ্ঠায় আঙুল রেখে ঘরের মধ্যে হাঁটেন, তারপর ঝোলানো বারান্দায় গিয়ে আকাশ দেখেন, হঠাৎ এ রকম দু'একটি লাইন যখন কানে ভেসে আসে।

'তোমারি সোনা বোঝাই হ'লো আমি তো তার ভেলা।
নিজেরে তুমি ভোলাবে ব'লে আমারে নিয়ে খেলা।'

অথবা

'আমার মুক্তি আলোয় আলোয় এই আকাশে।
আমার মুক্তি ধুলায় ধুলায় ঘাসে ঘাসে।'

তখন প্রায় চমকে ওঠেন। সুর সমন্বয়ে একটা কবিতার ধাক্কা অন্তর প্রদেশে গিয়ে আলো জ্বেলে দেয়।

আসলে কিছুদিন আগে মেয়েকে তিনি একটি পিয়ানো কিনে দিয়েছেন, একজন পরম রূপলাবণ্যবতী এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান যুবতী এসে সপ্তাহে দু'দিন তালিম দিয়ে যায়। ঐ পিয়ানো আসার পরেই সেটা বাজিয়ে মাঝে মাঝে গান শেখান মহিলা। আড়ালে নিজের সখ মেটান। তা মেটান, মেয়ের সঙ্গী হিশেবে ভালো। এর আগের তিনজনও অবশ্য খারাপ ছিলো না, প্রথম জন স্বামীর উপর রাগ ক'রে কাজ নিয়েছিলেন, স্বামী ডাকতেই সব ছেড়ে অভিমান ত্যাগ ক'রে ফিরে গেছেন। দ্বিতীয় মেয়েটি অবিবাহিত ছিলো, বিয়ে হ'য়ে চ'লে গেলো। তৃতীয়টি গেলো ঝগড়া ক'রে, এই চতুর্থ। ইনি তো সর্বরকমেই বেশ ছিলেন, হঠাৎ কী হ'লো? রোজ রোজ লোক বদলানো কি সোজা কথা নাকি? পছন্দ মতো পাওয়াও তো শক্ত।

এবারের কামাইটা লম্বা। একটা চিঠি লিখেছেন অবশ্য। তাতে এই অনুরোধ আছে, 'অন্য কারোকে নিযুক্ত করতে পারলে ভালো হয়, আমার পক্ষে কাজ করা আর সম্ভব হবে ব'লে মনে হচ্ছে না।' কেন মনে হচ্ছে না? কারণটা কী? হৃষীকেশ চিঠিটা প'ড়ে যায়। হয়েছেন। ইরেস্‌পন্‌সেবল্‌। চাকরি ছাড়লেই হ'লো? একটা

ছোট্ট মেয়ে। তার মনের দিকে তাকাবার কথা ভাবলো না একবার? কী চাই? আরো বেশী মাইনে? হ্যাঁ দেবো। এর নামই চশম-খোর। স্বার্থপর।

সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে উঠতে হৃষীকেশ এই সব ভাবছিলেন এবং অত্যন্ত ক্লান্ত বোধ করছিলেন। সরু অন্ধকার খাড়া খাড়া সিঁড়ি। চৈত্র মাস। সুন্দর বসন্তকাল, আজ ছায়া ছায়া রোদ আর উতল হাওয়া। তবু এই সিঁড়িটায় পা ফেলে মনে হচ্ছে জগতে হাওয়া নেই, আলো নেই। আশা আনন্দ কিছু নেই। রুমাল বার ক'রে তিনি মুখ মুছলেন, ঘাড় মুছলেন, তাঁর উজ্জ্বল শ্যাম বর্ণ লাল হ'য়ে গেলো।

এমিলি ওব্রাইন মানে ঐ এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েটি এই মহিলাকে একদম পছন্দ করে না। বলে রাস্টিক। বলে তোমার অমন ফুলের মতো মেয়েটাকে যা তা বানিয়ে দিচ্ছে। ও নিজে খুব আলাপী হাসি খুশি, কিন্তু একটু বেশি বেশি করে? তা করুক। সেটা হৃষীকেশের খারাপ লাগলো। সুন্দরী মেয়েদের সব ভালো। মাথায় একটা লাল রুমাল বেঁধে নীল পোষাক প'রে ব'সে যখন বাজায় একটা ঝড় ব'য়ে যায়। মেয়েকে দিয়ে ডেকে পাঠায় তাঁকে, পড়া ফেলে উঠে আসেন তিনি, বাজাতে বাজাতে বাজনার ব্যাখ্যা ক'রে শোনায়, বলে, 'দাঁড়াও তোমাকে আমি আর একটা বাজিয়ে শোনাচ্ছি।' গান বাজনায় অদক্ষ হৃষীকেশ চুপচাপ ব'সে থাকেন অদূরে, না বুঝেও বোঝার ভান করেন। এমিলি ওব্রাইন চা খেতে ভালোবাসে, বারে বারে চা এনে দেয় আয়া, হৃষীকেশও সঙ্গ দেন চা পানে, ওব্রাইন উঠে এসে হৃষীকেশের মুখের জ্বলন্ত সিগারেট থেকে নিজেরটা ধরায়।

মাস তিনেক হ'লো আসছে সে, এর মধ্যেই আপন হ'য়ে উঠেছে, অনেকক্ষণ থাকে, অনেকক্ষণ বসে, যতোক্ষণ ছাত্রী শেখায় তার চেয়ে বেশি বাজিয়ে শোনায় তার বাবাকে। সত্যি বলতে হৃষীকেশ রীতি-মতো এনটারটেইনড হন ওর দ্বারা। সপ্তাহে তো মাত্র দু'দিন, দুটো

দিনই সুন্দর ভরা থাকে। সে দু'দিন সন্ধ্যায় আর বন্ধু খুঁজতে হয় না, আড্ডার জন্য কেউ না এলেই বরং ভালো, অভ্যাস মতো না পড়লেও ক্ষতি নেই।

মেয়েটি বলছিলো, এই মাষ্টারনিটিকে তুমি তুলে দাও, আমিই দেখাশুনো করতে পারবো তোমার মেয়েকে। আরো একটা মারাত্মক কথা বলেছে। বলেছে, আমি বিয়েতে বিশ্বাস করি না, বন্ধুতায় বিশ্বাস করি। যদি তোমার ভালো লাগে আমি তোমাকে আমার নিবিড় সংসর্গও দিতে পারি। কী আছে এতে? ঈশ্বর শরীরও দিয়েছেন তার চাহিদাও দিয়েছেন, তা ব'লে বিয়েটা তো আর দেননি যে বিয়ে না হ'লেই কোনো চাহিদা মেটানো যাবে না অথবা চাহিদা হবে না।

কথাটা মারাত্মক হ'লেও এতোদিনের উদাসী, উপবাসী হৃষীকেশের মনে ধরেছে। এর মধ্যে যথেষ্ট যুক্তি আছে, যথেষ্ট অর্থ আছে। নিজেও এই ধরণের মতবাদেই বিশ্বাসী। তবে মেয়েটি সুন্দরী হ'লেও সংস্কৃতি নামক কোনো পদার্থ নেই। একটার বেশি দুটো কথা বললেই লোহা বেরিয়ে পড়ে। ফুর্তির পক্ষে খুব উপযুক্ত, কিন্তু দশ বছর মাষ্টারি ক'রে ফুর্তির শিকরটা মনে হয় শুকিয়ে গেছে। অথবা কোনো দিনই তা ছিলো কিনা সে জানে। মনে আছে প্যারিসে একটা নাইট ক্লাব থেকে ফিরে এসে বমি করেছিলেন।

মেয়েটির নাম এমিলি শুনে তিনি বলেছিলেন, এমিলি নাম কে রেখেছে? কার নাম জানো তো? এমিলি ব্রন্টি? পড়েছ তাঁর বই? মেয়েটা ঐ সুন্দর সুন্দর দুই চোখের ভাসা ভাসা দৃষ্টি নিয়ে হাঁ ক'রে তাকিয়ে রইলো। সাহিত্যের সঙ্গে তার সম্পর্কই নেই, সে শুধু মাঝে মাঝে রিডার্স ডাইজেস্ট পড়ে। আর এদিকে এদেশেরই মেয়ে তবু এ দেশকে আপন ভাবে না, বলে আমি দৈবাৎ এখানে আছি, আমার দাদামশায় ছিলেন খাঁটি ইংরেজ। এই একটা অদ্ভুত কমিউনিটি এরা না এ-পারের না ও-পারের। ঝুলে আছে ত্রিশঙ্কুর মতো। ভাষাটা পর্যন্ত বিদেশী।

মেয়েটাকে গ্রহণ করতে ঐখানেই আটকায় হৃষীকেশের। তিনি তো কুকুর বেড়াল নন। তাঁর মন আছে, শরীরের মতো মনেরও তৃপ্তি অতৃপ্তির প্রশ্ন আছে। তা নৈলে তো বেশ্যা বাড়িই যেতে পারেন। বাঁধা তো নেই। পয়সাও আছে। আর বিয়ে করতেই বা তার আপত্তি কী? মন নেই বলেই তো বিবাহের প্রশ্ন নেই।

তবু। তবু কিছুটা আকর্ষণ হচ্ছে মাঝে মাঝে। কাছে ঘেঁষে বসলে দাঁড়ালে লোভ হয়। কিন্তু লোভ ভালো না এই বোধও কাজ করে সঙ্গে সঙ্গে। গায়ে গা লাগাবার এই ইচ্ছাকৃত চেষ্টাটা ইচ্ছেকে বিগড়ে দেয়। ডরোথীর মধ্যেও এই ধরণের একটা ঝোঁক ছিলো। ভগবানের দেয়া এমন মূল্যবান শরীর নিয়ে এতো হেলা-ফেলার কী আছে? ওদের আর একটু দামী হওয়া উচিত।

এই প্রসঙ্গে হঠাৎ কন্যা মুনমুনের রক্ষয়িত্রীটির গাওয়া গানের দু'টি লাইন কেন জানি মনে প'ড়ে যায়। 'না চাহিলে যারে পাওয়া যায় তেয়াগিলে হাতে আসে, দিবসে যে ধন হারায়েছি আমি, পেয়েছি আঁধার রাতে।'

মহিলাটি তাঁকে আবার গানে দীক্ষিত করলেন নাকি? অবশ্য এর মধ্যে মহিলাটির অংশ আর কতোটুকু। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই দাঁড়িয়ে আছেন সমগ্র ক্যানভাস জুড়ে। তাঁরই বাণী তাঁরই সুর, বহন যেই করুক না কেন।

২

আসলে পিয়ানোটা হঠাৎ দুম ক'রে কিনে আনার পরে একদিন রাত্রিবেলা পাশে শুয়ে আদর ক'রে গলা জড়িয়ে ধ'রে মুনমুন তাকে বলেছিলো, 'বাবু আমার পিয়ানোটা দেখে মিস খুব খুশি হয়েছেন।' তখনো এমিলিকে রাখা হয়নি। ঘুম জড়ানো চোখে তিনি বললেন, 'তাই নাকি?'

'ওঁকে একটু বাজাতে দেবো ?'

'নিশ্চয়ই।'

'তোমাকে না জিজ্ঞেস ক'রে উনি হাত দিতে চান না।'

'এ আবার জিজ্ঞেস করবার কী আছে ? কেন উনি কি বাজাতে জানেন নাকি ?'

'না।'

'তবে ?'

'বলছেন পিয়ানো হারমনিয়মের মতোও বাজানো যায়, গান জানেন তো, তা হ'লে বাজিয়ে আমাকে গান শেখাবেন।'

তিনি ঠাট্টা ক'রে বলেছিলেন, 'ওরে বাবা আবার নাঁকি সুরে গান গাইবেন নাকি তোমার মিস ?'

অমনি মেয়ের রাগ। তক্ষুনি সে তার ছোটো ছোটো হাত সরিয়ে নিলো বাবার গলা থেকে।

তাড়াতাড়ি আদর করলেন তিনি, 'গান তো খুব ভালো জিনিষ। উনি বুঝি খুব ভালো গান করেন ?'

মেয়ে চুপ। তার ন' বছরের বালিকা হৃদয় রীতিমতো বেদনার্দ্র হয়েছে তার মিসকে ঠাট্টা করায়। বেচারা! মাকে তো পায়নি জীবনে মাতৃস্থানীয়া যে কোনো মেয়ের জন্যই তার টান। মহিলাটিও অবশ্য অত্যন্ত স্নেহশীল।

এই হ'লো মেয়ের গান শেখার ইতিহাস। শিখেওছে বেশ কিছু গান। খুব যত্ন ক'রে শেখান, নিজেও বোধহয় বেশ ভালোই গান করেন। ঠিক বোঝেন না তিনি, তবে মন্দ লাগে না।

আবার নতুন একটা নামও রেখেছেন মুনমুনের। দেশে ফেরার পরে মা রেখেছিলেন শীলা, উনি সেটাকে শুদ্ধশীলা করেছেন। শুনে তিনি চমৎকৃত। এই নাম রাখার মধ্যেও একটা রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। নাম রাখা একটা শিক্ষা বৈকি।

মেয়ের সঙ্গে রাত্রিবেলাই তাঁর যতো কথা। প্রসঙ্গ ঐ একটিই,

ঐ তার মিস। আবার মন দিয়ে না শুনলে রাগ। অবশ্য শুনে এক রকমের উপকারই হয়, বোঝা যায় টাকা খরচ ক'রে কেমন মানুষ রেখেছেন মেয়ের জন্য।

আর-এক রাত্তিরে বললো, 'আজ মিস কী বলেছেন জানো বাবু?'

'কী?'

'আমাকে সরস্বতী পুজোর দিন ওঁর বাড়ি নিয়ে যাবেন।'

'তাই নাকি?'

'বলেছেন তোমাদের বাড়িতে তো পুজো হয় না, আমি পুজো করবো তুমি দেখবে, আমাকে সাহায্য করবে। যাবো?'

'সেদিন যে তিনদিনের ছুটিতে আমরা কল্যাণীতে যাবো।'

'তা হ'লে একবার ওঁকেও কিন্তু নিয়ে যাবো।'

'নিশ্চয়ই।'

'সেদিন আমার চুল আঁচড়ে দিতে দিতে কী বললেন জানো?'

'কী?'

'বললেন তোমার মতো যার এমন একটা ছোট্ট মিষ্টি মেয়ে আছে তার আর দুঃখ কী? ছেলেমেয়ে থাকা খুব ভালো, না বাবু?'

মেয়েকে চুমু খেলেন তিনি, বললেন, 'তুমি না থাকলে আমি তবে একা একা কেমন ক'রে থাকতাম?'

চুপ ক'রে থেকে মেয়ে বললো, 'মা থাকলেও খুব ভালো, না?'

এইখানে মেয়ের জন্যে বুকের মধ্যে মোচড় খেয়ে ওঠে হৃষীকেশের।

তখন রাতের ঘুম কোথায় হারিয়ে যায়। অনেক পুরোনো কথা মনে পড়ে। শৈশব কৈশোর যৌবন — ফেলে আসা অনেক উজ্জ্বল দিন।

অক্সফোর্ডে তিনি কেন গিয়েছিলেন? নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করেন এতোকাল বাদে। চাকরি করছিলেন সরকারী কলেজে, কী ভূত চাপলো মাথায়, যে না খেয়ে না দেয়ে মা বাবাকে একটি কপর্দক সাহায্য না ক'রে উপরন্তু তাদের স্বল্পতম বিত্তের প্রায় সবখানিই

ভাঙিয়ে চ'লে গেলেন একদিন। কী লাভ হ'লো? মাষ্টার গিয়ে ছাত্র হলেন। ইংরেজের অহংকারের চরকায় খানিকটা তেল দিলেন। এখানকার বি. এ. পাস সোনার টুকরো ছেলেগুলো আবার ওখানে গিয়ে বি. এ. পড়ে, সেটাই তো নিজের দেশের পক্ষে যথেষ্ট অপমান। তার উপরে তিনি ছিলেন এম. এ. পাস একজন মাষ্টার, তিন বছর বি. এ. এম. এ. কতো ঘাগীকে পড়িয়ে-পড়িয়ে নিজে ঘাগীতর হয়েছেন তাঁর যাবার তো কোনো অর্থই ছিলো না। তবু গিয়েছিলেন। আর কী কষ্ট করেই না ছিলেন। শীতে হি হি ক'রে কেঁপেছেন সেই সস্তা অন্ধকার ঘরটায়, তবু কয়েক পেনি খরচ ক'রে আগুন জ্বালাতে কার্পণ্য করতে হয়েছে অর্থাভাবে। আর খাওয়া? অকথ্য। বাথরুম! থ্থু। প্রাকৃতিক ক্রিয়া কর্মের জন্য লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়।

পড়াশুনোই বা কী এমন আহা মরি। সত্যি বললে দম্ভের মতো শোনায়, কিন্তু তিনি বস্তুতই বাঁ হাতে লিখে ডিগ্রীলাভ করেছিলেন। অবশ্য ডিগ্রীলাভের পরেই একটা ভালো কাজ পেয়ে গিয়েছিলেন, সেটা লাভ। লাভও লোকসানও। ঐ কাজটা করতে গিয়েই তো তিনি ডরোথীর প্রেমে পড়েন। সে ওখানে টাইপিস্ট ছিলো। দেখতে নিতান্ত সাদামাটা, তবে পোষাকে-আসাকে দুরস্ত। আলাপ হবার পরে অনেক সাহায্য করেছিলো তাঁকে। ভালো একটা ঘর ঠিক ক'রে দিয়েছিলো, লণ্ডন শহরের আনাচ-কানাচ চিনিয়েছিলো, ভারতীয় রান্নার রেস্টুরেণ্টে নিয়ে মাংসের কারি আর সরু চালের ভাত খাইয়ে পেট ঠাণ্ডা ক'রে দিয়েছিলো, টুইডের কোট কিনে দিয়েছিলো — ঐ বন্ধুহীন অপরিচিত জায়গায় এই সাহায্য এই সঙ্গ মোহের মতো কাজ করেছিলো। প্রেমে পড়তে একটুও দেরি হয়নি। সাধারণ মেয়ে ডরোথী তাকে নিয়ে সুখের সংসার পাততে আর দেরি করেনি।

কিন্তু ক্লিক করলো না। যৌবনের তাপে কয়েকদিন অগ্ন্যুদ্গার করেই সব শীতল হ'য়ে গেলো। মাঝখান থেকে একটা সন্তান এসে গেলো দু'জনের মিলিত জীবনের স্বাক্ষর হিশেবে। বোধহয় বৌকে

ভালোবাসতে পারেননি বলেই মেয়েকে দেখে একেবারে দিশাহারা মমতায় ভেসে গিয়েছিলেন।

মেয়ের মা ব'লে ডরোথীকে তিনি আজীবনই সহ্য করতে রাজি ছিলেন। গরমিল থাকলে কী এসে যায়! দু'জনে দু'জনের মনে থাকবেন, চাকরি করবেন, উপার্জন করবেন, লেখাপড়া করবেন, আর কিসের দরকার? কিন্তু ডরোথী আবার প্রেমে পড়লো। স্বামীকে বিশ্রি লাগছিলো তার। এই ধরণের স্বামী তার দু'চোখের বিষ। বলেওছে সে কথা। হাজার বার বলেছে, ফুর্তি নেই, আমোদ নেই, আহ্লাদ নেই, কেবল বই বই আর বই। জঘন্য। বমি আসে। ফিরে উল্টে উনিও অবশ্য অনেক কথা বলতে পারতেন, বলেননি। ঝগড়া করতে তার যতো খারাপ লাগে, এমন আর কিছুতে নয়। সমকক্ষের সঙ্গে তর্ক করা যায়, আর্গু করা যায়, মত বিনিময় চলে, ওর সঙ্গে কী করবেন তিনি? ও যে ভাষায় পান থেকে চুন খসলেই চ্যাঁচাতো, সে ভাষায় জবাব দেবার শক্তিই বা তাঁর কোথায়।

তারপর একদিন বিচ্ছেদ হ'লো। মেয়েকে নিয়ে টানা পোড়েন চলেছিলো কিছুদিন, কখন সেটাও স্তিমিত হ'য়ে এলো। মেয়ে তার বাবারই রইলো বারো আনা, বাকী চার আনা ওর। শেষে মেয়ের ভবিষ্যৎ ভেবেই একদিন চাকরিতে ইস্তফা দিলেন তিনি। একটা ফুটন্ত ফুলের মতো মুনমুনকে বুকে চেপে ফিরে এলেন মাতৃভূমিতে। কয়েক-দিন নিজের মায়ের কাছে রাখতে হয়েছিলো, পরে কাজে যোগ দিয়ে নিয়ে এলেন। মার মনে অবশ্য খুব কষ্ট হয়েছিলো নীলরক্তের সুন্দরী নাতনীকে ছেড়ে দিতে, তা নিজের সন্তানকেই ছেড়ে দিয়েছেন এতো নাতনীই।

সেই সময়েই পুনর্বিবাহের জন্য খুব পীড়াপীড়ি করেছিলেন মা, ছেলের চেয়ে ছেলের মেয়ের জন্যই তাঁর চেষ্টা কিছুটা সীমা ছাড়িয়েছিলো নইলে কারো উপর কিছু আরোপ করায় পিতামাতা কেউই অভ্যস্ত নন।

ভাবতে ভালো লাগে মা বাবা তো কেউ পছন্দ ক'রে পায় না। যার ভাগ্যে যেমন জোটে, কিন্তু ভাগ্যে এই দৈব আত্মীয়তাটা খুব মনোমত হয়েছিলো। অথচ যাকে তিনি নিজে পছন্দ ক'রে গ্রহণ করলেন তার সঙ্গে সম্পর্কটা টিকলো না। কী আশ্চর্য!

মুনমুনের এই গৃহপালিকা এবং শিক্ষিকাটি যার নাম শ্রীমতী অনামিকা মিত্র, যার জীবন যাপন বিষয়ে কিছুই জানেন না তিনি, মহিলাটির রুচি পরিশীলিত। ধরণ-ধারণ চলন-বলন সাজ-সজ্জা বেশ সম্ভ্রান্ত। কখনো যেচে কথা বলেন না কিন্তু প্রয়োজনে সপ্রতিভ। আটমাস আছেন কিন্তু একদিনের জন্য বিরক্ত উৎপাদনকারী একটি আচরণ লক্ষ্য করেননি। এ পর্যন্ত মুনমুন যে ক'জন মহিলার সঙ্গে থেকেছে, মনে হয় এঁকেই সবচেয়ে ভালোবেসেছে, পছন্দ করেছে। ইনিও যে ওকে সত্যিই স্নেহ করেন সেটা বোঝা যায়। টাকা দিয়ে হৃষীকেশ আর যাই কিনুন, এই ভালোবাসা কিনতে পারবেন না কখনো। সুতরাং রাগই করুন যাই করুন, এইসব ভাবনাও এই আসার পিছনে অনেক কাজ করেছে। একটা শেষ কথা ব'লে দেখতে চান, নইলে এমিলি তো আছেই। মুশকিল হচ্ছে মুনমুন আবার তাকে তেমন পছন্দ করে না।

৩

কেন করে না? সেটাও ভাববার বিষয়। এমিলি ওকে যথেষ্ট আদর করে। এই যে মহিলা দায়িত্ব জ্ঞানহীনের মতো বারে বারে কামাই করছেন, এমিলি না থাকলে তো চোখে অন্ধকার দেখতেন তিনি। চ'লে আসে রোজ অন্য কাজ ফেলে, মেয়েকে নাওয়ায় খাওয়ায় ঠিক মতো জুতো জামা পড়িয়ে দেয় তবু মেয়ের মন ওঠে না। একটু দুষ্টুই হয়েছে বোধহয়। এমিলি তাই বলছিলো। বলছিলো, কথা গে ন

শোনে না, যেটা করবে ঠিক করে সেটা করতেই থাকে, মোট কথা স্পয়েল্ট চাইল্ড, অতিরিক্ত আদরে কিছুটা মাথা খাওয়া হয়েছে।

কথাটা মিথ্যে নয়, তিনি মেয়েকে একটু বেশীই প্রশ্রয় দিয়ে থাকেন। কী করবেন? মাতৃহীন মেয়ে, তার আবদার তো একটু থাকবেই। ওর মা থাকলে নিশ্চয়ই সব অন্যরকম হ'তো। একজন আদর করতো, একজন শাসন করতো, একটা ভারসাম্য বজায় থাকতো তবে।

যাকগে বাজে চিন্তা, এখন এই ভদ্রমহিলা ভালোয় ভালোয় কাজে যেতে রাজি হলেই হয়। অন্য কোথাও এর চেয়ে বেশি মাইনের কাজ পেয়েছেন না কি? পেতে পারেন, যোগ্যতা তো আছেই। সত্যি বলতে এই কাজে তো তেমন সম্মানও নেই। সারাদিনের জন্য অন্যের সন্তান রক্ষণাবেক্ষণ করা, তার বাড়িতে থেকে খাওয়া-দাওয়া করা এটাকে আমাদের দেশে খুব সম্মানের চোখে দেখে না। নিশ্চয়ই খুব বিপন্ন হয়েই কাজটা নিয়েছিলেন। প্রথম সুযোগেই ছেড়ে দিচ্ছেন তাই।

সত্যি যদি ছাড়েন, আর মেয়ে যদি এমিলিকে পছন্দ না করে তা হ'লে তো আবার সেই ঝামেলা। বিজ্ঞাপন দাও। ইণ্টারভিউতে ডাকো। তার চেহারা ছাখো উচ্চারণ শোনো, কথাবার্তার ধরণ-ধারণ লক্ষ্য করো, পোষাক-আসাকে কেমন রুচি সেটা নিরীক্ষণ করো — উঃ ভাবতেও মাথা ধ'রে আসছে।

যে নির্ঝঞ্ঝাট জীবনের জন্য তিনি আর বিবাহে পর্যন্ত রাজি নন, এখন দেখছেন সেই বিবাহই এর চেয়ে অনেক ভালো। তবু দায়িত্বটা অন্যের উপর চাপানো যায়। দেহ ধারণ করলে শুধু দেহের রোগ-শোকের বালাই যে আছে তা নয় মানসিক অশান্তিও কম থাকে না। দেহ থাকলেই মনের প্রশ্ন, আর মন থাকলেই তার চিন্তা। এর চেয়ে মা বাবাকে আসতে লিখে দিলেই ভালো। ঐ এক মফঃস্বল শহরের মাষ্টারি আর বাবা ছাড়তে পারছেন না। আমাকে ছেড়ে থাকবেন, তবু মাষ্টারি ছাড়বেন না। হঠাৎ ভারী রাগ হ'লো তাঁদের উপর। আর

তারপরেই মনে হ'লো মায়ের সেই মনোনীত মেয়েটিকে তখন অমন একবাক্যে নাকোচ ক'রে না দিলেই হ'তো। সত্যি বলতে চাকরি ছেড়ে বাবা আসবেন কেন? কেউ কি কারো উপর আশ্রিত হ'য়ে থাকতে চায়? ছেলে যতো যোগ্যই হোক না কেন, সে তো আর তার পিতামাতাব ইচ্ছে মতো চলবে না? বরং পিতামাতাকেই তার ইচ্ছে মতো চলতে হবে। আজ যদি হৃষীকেশ তার নিজের সুবিধের জন্য কাজ ছাড়িয়ে এনে তার বাবাকে সপরিবারে নিজের কাছে রেখে দেন, কাল যে সেই হৃষীকেশ আবাব তাঁর অন্য সুবিধের জন্য তাদের অন্যত্র যেতে বলবেন না তার কি মানে আছে? সন্তানরা সর্বদাই স্বার্থপর হয়, তাদের তালে পা ফেললে বাপ মায়ের খানা-খন্দে পড়ার শঙ্কাই থাকে বেশী।

এই তো বলা নেই কওয়া নেই চাকরি করতে কবতে বিলিতী ডিগ্রীর সখ চাপলো তাঁর, তিনি কি তখন একবারও ওঁদের কথা ভাবলেন? ঠিক তো চ'লে গেলেন। বাবা তখন চোখের ছানিতে কষ্ট পাচ্ছিলেন, মা রীতিমতো বিপন্ন তবু তো গেলেন। শুধু কি ওঁদের অসহায় রেখেই চ'লে গেলেন? তা নয়, বাবার মাষ্টারি জীবনেব সামান্য সঞ্চয়টুকুও মুছে চেঁছে নিয়ে গেলেন। অবশ্য মন খারাপ হয়েছিলো খুবই, চাকরি পাবার সঙ্গে সঙ্গেই মোটা টাকা হাতে পাঠিয়েছেন। চিঠি লিখতে কখনো দেরি করেননি, কিন্তু চট ক'রে বিয়েটাও তো ক'রে ফেললেন? আর বিয়ের পরে? ডরোথী বললো, মাইনের সবটাকা আমার হাতে দাও। অমনি রাজি। তখন যে প্রেমের প্রথম অবস্থা!

আর একবার একটা নিয়ম ক'রে ফেললেন আর কি তা ফেরানো যায়? বাচ্চা হ'য়ে গেলো এক বছর পার হ'তে না হতেই, আর প্রেম ছুটে গেলো দু'বছরের মধ্যেই। যেন ঘুম থেকে জেগে উঠলেন, এমনি ভাবেই আবার সেই পুরোনো বাবা মাকে মনে প'ড়ে গেলো। একমাত্র ছেলে তিনি, তিনি না থাকলে যে বাবা মার কিছুই থাকে না, এবং সে কথা যে তাঁরা স্পষ্ট ক'রে মুখে না বললেও চোখের ভাষায় ভঙ্গির

আকুতিতে কতোবার বলেছেন তা কি তিনি বোঝেননি? বুঝেছে তবু তো ভেবেছিলেন ইংলণ্ডেই স্থায়ী হবেন। তবু তাদের মতামতের দাম না দিয়েই বিয়ে করেছিলেন, স্ত্রীর সঙ্গে ভাব থাকলে নিশ্চয়ই শ্বশুর বাড়ির দেশেই তাঁর দেশ হ'তো।

আর আবারও যে তিনি যাবেন না তারই বা স্থিরতা কী? যাবার কথাও উঠছে। খুব সম্ভব আগামী বছরই যাবেন। তখন কী আর মা বাবার জন্য ব'সে থাকবেন? ওরা যে একাকে সেই একা। কাজেই কাজ ছেড়ে বাবা চ'লে আসুন একথা তিনি বলবেনই বা কোন মুখে?

এমিলি বলছে, 'ওকে বোর্ডিংয়ে দিয়ে দাও।'

প্রস্তাবটা খুব অবহেলার যোগ্য নয়, বরং নিশ্চিন্ত থাকার পক্ষে ভালোই। কিন্তু মন চায় না। মেয়েকে ছেড়ে থাকার কথা ভাবলেই বুকটা ফাঁকা ফাঁকা লাগতে থাকে। তা নৈলে এখন ওর ন'বছর বয়েস হয়েছে, বোর্ডিংয়ে না থাকতে পারার আর কারণ নেই কোনো। যখন ছোটো ছিলো, প্রতিপালনের বয়েস ছিলো, তখন উপায় ছিলো না এদের করতলগত হওয়া ছাড়া, এখন আর কেন খোসামোদ করতে আসা?

খোসামোদই তো! নয় তো এই বেলা তিনটের প্রচণ্ড গরমে এই খুপরি সিঁড়ি বেয়ে তিনি উঠছেন কেন? তাঁর নেমে যেতে ইচ্ছে করলো। নামলেনও দু'সিঁড়ি, কিন্তু মেয়ের জলভরা দৃষ্টি তক্ষুনি তাঁকে উর্দ্ধগামী করলো।

কাল মুনমুন কেঁদেছে। বোর্ডিংয়ে যাবার কথায়, চোখের জলে তার গাল ভেসে গেছে। তিনি বলেননি, বলেছে এমিলি।

অনেক সাধ্য সাধনা ক'রেও বেচারা মন পায় না ওর। যেদিন থেকে জেনেছে তার মিস তার বাবাকে অন্য লোক নিযুক্ত করতে চিঠি লিখেছেন সেদিন থেকেই তার মুখে একবিন্দু হাসি নেই। এই যে এমিলি এতো করছে কোনো প্রতিদান নেই। ঠিক মতো খাবে না, ইশকুলে যাবার সময় হরিচরণের সঙ্গে গোলমাল করবে, ইশকুল থেকে ফিরে ছুঁড়ে ফেলবে বই খাতা, জুতো জামা না ছেড়েই। হাত মুখ না

ত

য়েই গড়িয়ে পড়বে বিছানায়। এমিলির ধৈর্যচ্যুতি ঘটলে দোষ দেয়া যায় না। তাই রেগে বলেছে, তোমার মতো দুষ্টু মেয়ের বোর্ডিংই উপযুক্ত জায়গা।

হৃষীকেশ যতোই মেয়েকে আদর দিন না কেন, এটা তিনিও বরদাস্ত করতে পারেন না। ডিসিপ্লিন শিখবে না কেন? রাগ তিনিও করেছেন, তিনিও বলেছেন, 'হ্যাঁ, ঠিক। আমি তোমাকে বোর্ডিংয়েই দেবো।' তাতেও বোধহয় এতো কাঁদতো না যদি না এমিলি বলতো, তোমার ঐ নার্সটিই তোমার মাথা খেয়েছে, যেমন নিজে গ্রাম্য তেমনি তোমাকেও অসভ্য তৈরি করেছে।

এ-কথার পরেই সেই যে মেয়ে বালিশে মুখ লুকোলো, আর তাকে তোলা গেলো না। হৃষীকেশও বিরক্ত হ'য়ে বসার ঘরে বসলেন এসে। এমিলির সঙ্গে চা খেলেন, গল্প করলেন, পিয়ানো শুনলেন। যাবার আগে এমিলি খুব একটা অদ্ভুত কথা বললো। বললো, তোমাকে আমি ভুল বলেছিলাম। আমি স্ত্রীপুরুষের বন্ধুতায় আর বিশ্বাসী নই, বিবাহেই বিশ্বাসী। তুমি কি একবার ভাববে এই নিয়ে?

তিনি অবাক। এ নিয়ে তিনি ভাবতে যাবেন কেন? বিবাহ বা বন্ধুতা, বিশ্বাস বা অবিশ্বাস এ-সব প্রসঙ্গে তার কোনোই আগ্রহ নেই। যা বলবার ও-ই বলে, যা ভাববার ও-ই ভাবে। যদি এমিলি মনে ক'রে থাকে বন্ধুতা ক'রে তিনি তাকে দৈহিক ভাবে গ্রহণ করতে সম্মত হবেন সেটাও যেমন ভুল, বিবাহ ক'রে স্বামীর অধিকারে গ্রহণ করার প্রশ্নও তেমনি সম্ভাবনার পরপারে।

অর্থাৎ এমিলি কি বলতে চায় যে বন্ধুভাবে তুমি যখন আমাকে নিলেই না, তখন স্ত্রী হিশেবে নাও। কেন? এমিলি কি তবে তাঁকে ভালোবাসে? মাত্র তো চার মাস কাজে লেগেছে, কী এমন হ'লো যে একেবারে ভালোবাসায় প'ড়ে গেলো? অবশ্য তিনিও রূপে মুগ্ধ হ'য়ে গোড়া থেকেই কিছুটা প্রশ্রয় দিয়েছেন। কিন্তু সেটা এমন কিছু নয়, যা থেকে ওর এতো অনুরাগ জন্মাতে পারে।

একদিন এক বন্ধু এসেছিলো, পিয়ানো দেখে বললো, 'কে বাজায়? মেয়ে না তুমি?'

তিনি বলেছিলেন, 'পিতাকন্যা দু'জনের একজনও না, সস্তায় পেয়ে গেলাম কিনে নিলাম, ভালো একজন বাজিয়ে দিতে পারো তো মুনমুনকে শেখাই।'

'হ্যাঁ — এঁ্যা —,' তক্ষুনি সে মাথা নাড়লো, 'আমার স্ত্রীকে একটি মেয়ে শেখাতো, বেশ ভালো বাজায়, আমি পাঠিয়ে দেবো তোমার কাছে। এই বাজনা শেখানোই তার জীবিকা। দেখতে সুন্দরী, আবার প্রেমে প'ড়ে যেয়ো না।'

তিনি বলেছিলেন, 'মন্দ কী।'

পরে বন্ধুর কাছে শুনেছিলেন হৃষীকেশ একজন ইংরেজ দুহিতার প্রাক্তন স্বামী শুনে নাকি মেয়েটির ভক্তি শ্রদ্ধা দুর্নিবার হ'য়ে উঠেছে। তার উপরে যখন শুনেছে আবারো যাবার কথা হচ্ছে, তখন নিজেব দেশের কথা ভেবে প্রায় চোখে জল এসে যায় আর কি।

'নিজেব দেশ মানে?'

'নিজের দেশ মানে নিজের দেশ। চোদ্দোপুরুষে কেউ যায়নি সেখানে, কোন সাহেবের কোন কুকর্মের ফলে কোন কুলি রমণীর গর্ভে জন্ম তার ঠিক নেই, তবু সে নিজেকে ঐ মাটিতেই বসিয়ে রেখেছে। যে কোনো শর্তে যে কোনো লোকের সঙ্গে যে কোনোদিন চলে যেতে রাজি।'

'ডেঞ্জারাস্।'

'তা বলতে পারো এরা সবাই প্রায় এ-রকম। আমি যে পাড়ায় থাকি আর যে কাজ করি, দুই কারণেই এদের অনেকের সঙ্গে মেলামেশা করতে হয়। কাজেই এসব দেখতে জানতে কিছু আমার বাকী নেই। এই এমিলি ব্রাউনকেই কথা তুলে দেখো না, অমনি বলবে আমার ঠাকুর্দার বাবা ছিলেন খাস ইংরেজ, ঠাকুর্মার মা ছিলেন আইরিশ, আমরা তাদেরই বংশধর। ভারতবর্ষে আছি ব'লে আমরা মোটেও ভারতীয় নই। আরে, একদিন তো আমার স্ত্রীর সঙ্গে এ নিয়ে তুমুল তর্ক।'

তবে কি — হৃষীকেশ ভাবলেন মনে মনে, আমাকে শিখণ্ডী ক'রে ও ওর স্বদেশে স্বজাতির কাছে গিয়ে পৌঁছুতে চায় ?

আরো একটা কথা, রাত্রিবেলা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে মুনমুন বলছিলো, 'আর আমি পিয়ানো শিখবো না, উনি আমার হাতে স্কেলের বাড়ি দেন, আমাকে দেখতে পারেন না, আমাকেও না আমার মিসকেও না. ঐ জন্যই উনি আসবেন না লিখেছেন।'

তারপরেই ঝরঝর কান্না। সে কি থামে ? সেই থেকে মেয়ের জন্য সত্যি মনটা খারাপ হ'য়ে রয়েছে। কলেজে গিয়েও বারে বারে অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়েছেন। তারপরে এসেছেন এখানে।

কিন্তু সিঁড়ি কি আর শেষ হবে না ?

হ'লো। শেষ সিঁড়িতে পা দিলেন তিনি, রৌদ্রজ্বলা মস্ত ছাদের দিকে তাকিয়ে তাঁর চোখ ঝলসে গেলো, চশমার কাচ মুছলেন।

৪

নন্দিনী এই খানিকক্ষণ বাড়ি ফিরলো। তাকে কিছুটা দিশাহারা দেখাচ্ছিলো। বিছানায় ব'সে দেয়ালে ঠেসান দিয়ে নিঃঝুম হ'য়ে থাকলো। সারা শরীরে ঘাম জব জব করছিলো, গলা শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে যাচ্ছিলো, মাথার মধ্যে ঝিঁ ঝিঁ পোকার শব্দ শুনছিলো। কিন্তু সে বিশ্রাম করছিলো না, ভয় ঠেকাচ্ছিলো। ভূত ভাবলে রাত্রিবেলা ভীতু লোককে যে ভয় আক্রমণ করে সেই ভয়। কিন্তু এখন রাত নয়, রাত হ'তে দেরি আছে। এখন দুপুর, প্রায় দেড়টা, সকাল থেকে তেমন রোদ ছিলো না, আকাশ মেঘলা ছিলো, এখন সূর্য আবার প্রচণ্ড তেজ বিকীর্ণ করার মুখে।

উঠে জল খেলো, পাখা ছেড়ে দিয়ে বাতাস খেলো, সকাল বেলাকার পরিত্যক্ত চায়ের বাসনগুলোর দিকে তাকিয়ে বিরক্তি

হ'লো। পিঁপড়ে থিক থিক করছে পেয়ালা পিরিচে, ঘরটা অপরিষ্কার। হবেই, প্রায়ইতো ঝাঁট-পাট পড়ে না। ঝাঁট-পাট ক'রে কী হবে, আর কতোক্ষণ আছে এখানে ঠিক কী? খোলা ছাদের উপরে একা এই ঘরখানার উপর মায়া প'ড়ে গেছে, ছাড়বে ভাবতে কষ্ট হয়, কিন্তু ছাড়তেই হবে, উপায় নেই, ছাড়তেই হবে।

ঢক ঢক ক'রে পুরো এক গ্লাস জল খেয়ে তবু নন্দিনী শিথিল হাতে ঝাঁটা ধরলো। খোলা জানালা দিয়ে হাওয়া এলো জোরে, ধুলোগুলো ঘুরপাক খেলো, নন্দিনী মুখে বিরক্তিসূচক আওয়াজ করলো, পচ্‌চা। হাত প্যাঁচানো খোপাটা খুলে চুল ছড়িয়ে পড়লো। পিঠে, ঘন, লম্বা আর ঢেউ খেলানো সেই চুল বাঁ হাতের ঝাপটায় সরিয়ে ডান হাতের অভ্যস্ত ভঙ্গিতে উড়ে যাওয়া ধুলো ময়লা আবার জড়ো ক'রে নিয়ে এলো দরজার কাছে।

কোথাও এক ফোঁটা শব্দ হ'লে সে চমকে চমকে উঠছিলো। তার বুকটা থেমে যাচ্ছিলো। দেহ হিম হ'য়ে আসছিলো। ঘর ঝাঁট দেয়া শেষ ক'রে এবার স্নান করার কথা ভাবলো। কোণে গুছোনো আলনা থেকে টেনে নিলো শাড়ি জামা, চায়ের বাসনগুলোও নিলো। তারপর বাথরুমে এলো। বাথরুম মানে ঘেরাও করা একটু জায়গা। ড্রামে তোলা জল। এই চিল কুঠির ছাদের উপরে জলের ব্যবস্থা নেই কোনো, ঠিকে ঝি রাস্তার কল থেকে এনে রেখে যায়।

কৃপণ হাতে মন ডুবিয়ে ডুবিয়ে অল্প অল্প জলে কাপ প্লেট ধুয়ে নিয়ে এলো ঘরে, সাজিয়ে রেখে স্টোভ জ্বালিয়ে চাল ডাল নুন সব্জি সব এক সঙ্গে এক ডেক্‌চিতে নরম আঁচে বসিয়ে দিয়ে আবার ঘেরাও করা স্নান ঘরে এসে পর্দা টেনে একটু যেন নিশ্চিন্ত হ'লো। মনে হ'লো এখানে কোনো ভয় নেই, এখান থেকে কেউ তাকে খুঁজে বার করতে পারবে না।

এক ধরণের নিশ্চিন্ত ভাবেই এই আশ্রয়ে বাস করছিলো নন্দিনী। তার আগে দু'বছর কেবল এখান থেকে ওখানে আর ওখান থেকে

সেখানে। বন্ধুরা তাকে কম সাহায্য করেনি, তাদের প্রতি সত্যি তার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। এক বিবাহিত বন্ধুর বাড়িতেই সব চেয়ে বেশীদিন ছিলো সে; তার স্বামী বদলী হ'য়ে গেলো, বলেছিলো, 'চলুন, আমাদের সঙ্গে, ওখানে আমি ঠিক আপনাকে একটা চাকরি জোগাড় করে দেবো।'

যায়নি নন্দিতা। যাবার কথাই ওঠেনি। ওদের সঙ্গে সে কোথায় যাবে? মান সম্মান বলেওতো একটা জিনিস আছে? (আমার আবার মান সম্মান!)

জলচৌকিতে ব'সে সাবান জল দিয়ে পায়ের পাতার ধুলো মার্জনা করলো। পায়ে জল দিতে ভালো লাগছিলো খুব। মনের ভয়ে একবার দারুণ গরম লাগছে একবার দুরন্ত ঠাণ্ডা। কী জীবন। কী অবস্থা। এই সাত বছরে তো সে কম ঘাটের জল খেলো না। যতো প্রাণান্ত ক'রে সে বেঁচে আছে তা কি কেউ বুঝতে পারে তাকে দেখে? কেউ না। না, কেউ না। কারো কাছে সে ধরা দেয় না, কিছু বলে না, সব দুঃখ সব বেদনা ধুয়ে মুছে পরিষ্কার ক'রে রাখে চেহারার সকল ভঙ্গি থেকে। আভাসে ইঙ্গিতে শুধু মঞ্জুলাকেই যা একটু বলেছিলো। তাও সব কিছু নয়, সব কিছুর কণাতম মাত্র। ওদের কাছে ওদের সাহচর্যে অনেকগুলো দিন তার নিরাপদে কেটেছিলো। ঐ জন্যই, কিছুটা শুনে এবং বাকীটা আন্দাজ ক'রে নিয়ে যেতে চাইছিলো ওরা। চমৎকার ভদ্রলোক। মঞ্জুলা প্রেম ক'রে বিয়ে করেছে। ওর স্বনির্বাচিত স্বামীটি সত্যি সুনির্বাচিত।

আচ্ছা ওদের কাছে চ'লে গেলে কেমন হয়? ঝপ্ ঝপ্ ক'রে গায়ে জল ঢালতে ঢালতে চিন্তাটা চমকে উঠলো নন্দিনীর মনে। যদি আজই যাই? মন্দ কী? যে অন্ধকার ওৎ পেতে ব'সে আছে, কোনো রকমে এর হাত থেকে এই মুহূর্তে তো বাঁচা যাবে। বলবে না হয় বেড়াতে এসেছি। তুই ছাড়া আর তো আমার বান্ধবী ব'লে কেউ নেই। অবস্থাতো সবই জানিস।

কী জানে? কিচ্ছু না। কিচ্ছু না। শুধু জানে একটা চাকরির খোঁজে সকলের অমতে জোর ক'রে অন্যান্য বারের মতোই চ'লে এসেছে বাড়ি থেকে। মঞ্জুলা ঠাট্টা ক'রে বলেছিলো, 'এই নিয়ে তোর ক'বার গৃহত্যাগ হ'লো রে?'

তা অবশ্য সত্য। জীবনের প্রথম থেকেই তার গৃহত্যাগ। এইবার সেটা একেবারে কায়েমী হয়েছে, এই যা তফাৎ। মঞ্জুলা তার ছেলেবেলাকার বন্ধু। এক সময়ে কাছাকাছি বাড়িতে ছিলো। বাড়ির সঙ্গে তার যুদ্ধটা কিছু দেখেছে বৈকি। অবশ্য বড়ো হ'তে হ'তে ওরা চ'লে গেলো, আর দেখা হ'লো এই অবস্থায়। তবে এবার গৃহত্যাগের নমুনায় কিছুটা অভিনবত্ব ছিলো।

এবার সঙ্গে তার বাবা ছিলেন। সেই ছোটোখাটো স্নেহপ্রবণ মানুষটি। তিনি তাকে নিয়ে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে প্রথমে এরোড্রামে এলেন, প্লেনে ক'রে এক-দু'ঘণ্টায় চ'লে এলেন এই কলকাতা মহানগরীতে। দমদমে নেমে নন্দিনী বললো, 'এবার তুমি ফিরে যাও বাবা, আমার জন্য ভেবো না।'

তবু বাবা ফিরে গেলেন না। তবু তিনি না ভেবে পারলেন না। সেই রাতে সেই দমদম এয়ারপোর্টেই আশ্রয় নিলেন মেয়ের সঙ্গে, ভোর না হ'তে মেয়ের নির্দেশেই শহরে এসে কোনো এক বাড়ির কড়া নাড়ালেন। এই শহর তিনি চেনেন না, তাঁর মেয়েই চেনে। বাড়িটা নন্দিনীর এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মামাবাড়ি, বোর্ডিং জীবনে সে বহুবার এ-বাড়ির আতিথ্য গ্রহণ করেছে, এ-বাড়ির লোকেরা তাকে শেষে আর অতিথি হিশেবে দেখেনি, বাড়ির মেয়ে হিশেবেই দেখেছে। সম্পর্ক অনেক দিন প্রবল ছিলো, ইদানিং নিবু নিবু। তবু নন্দিনী এদের এখানে এসে ওঠাই স্থির করলো। আর নন্দিনীকে পৌঁছে দিয়ে সেদিনই তার বাবা শুষ্ক মুখে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে গেলেন আবার, যাবার আগে হাতে ধ'রে ব'লে গেলেন, 'চিঠি লেখার দরকার নেই। ক'দিন নিঃশব্দেই থাকো, আমি খোঁজ নেবো।' তারপরেই কপালে করাঘাত করলেন, 'এর চেয়ে আমার মৃত্যু ভালো ছিলো।'

বাবা বললেন, তাঁর মৃত্যু ভালো ছিলো, বাড়ির লোকেরা বলে-ছিলো নন্দিনী কেন ম'রে গেলো না। নন্দিনীর চোখের তারায় সামান্য হাসির রেখা ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেলো। এরপরে বাবা একটি ভারি মানি ব্যাগ গুঁজে দিলেন হাতে। বললেন, 'যেখানেই থাকো খামে ভ'রে শুধু ঠিকানাটা পাঠিয়ো, আমি একমাস বাদে আবার আসবো।'

হয়তো এসেছিলেন, হয়তো আসেননি, আর কোনো খবর জানেনা সে। মাতুলালয় থেকে দু'দিন বাদেই একটা মহিলা বোর্ডিংয়ে উঠে যায়, সেখান থেকে এক মাসের আগেই এক গণ্ডগ্রামে একটা ইশকুল মাষ্টারির চাকরি নিয়ে চ'লে যায়। বাবাকে আর ঠিকানাটা দেয়া হয়নি। কী দরকার। ধরা যাক না সে ম'রে গেছে। প্রেরকের নাম ঠিকানা না দিয়ে কিছু টাকা একবার পাঠিয়ে দিয়েছিলো বটে।

কী বা মাইনে ছিলো! গ্রামের জমিদারের দানে তৈরি হয়েছিলো সে ইশকুল, তিন বছর টিম টিম ক'রে চলেছিলো তারপর উঠে গেলো। যেখানে গোরুর গাড়ি ছাড়া যান ছিলো না, বিদ্যুৎ কাকে বলে জানতো না, মেয়েরা লেখাপড়া শিখলেও সচ্চরিত্র থাকবে সে ছিলো তাদের স্বপ্নের অগোচর। সুতরাং টাকা দিয়ে লগি ঠেলে ঠেলে এক ফোঁটা অন্ধকারও দূর করতে না পেরে জমিদার ক্লান্ত হ'য়ে বললেন, তুলে দাও আপদ, এখানে কিছু হবার নয়।

চোখে সর্ষে ফুল দেখেছিলো নন্দিনী। আবার কোথায় যায় ভেবে আকুল হ'য়ে উঠেছিলো। তার ভয় তখনো তাকে মুক্তি দেয়নি। তখনো এই রকমই কোনো অখ্যাত জায়গায় নির্বাসনে না থাকার কারণ ঘটেছে ব'লে মনে হয়নি। এই সময়ে জমিদার ডেকে পাঠালেন, বললেন, 'বাড়ির মেয়েদের ছোটো বড়ো সবাইকে অক্ষর চেনাও, মাইনে পাবে পঞ্চাশ টাকা, খাওয়া থাকা ফ্রী।'

ইশকুলে পেতো আশি টাকা, কিন্তু চাল-ডাল তো কিনতে হ'তো? ঘর ভাড়া বাবদ আবার দশ টাকা দিতে হ'তো, বলতে গেলে সবটাই প্রায় খরচ হ'য়ে যেতো। বরং এই প্রস্তাবটা সেদিক থেকে লাভ-

জনকই বলতে হবে। সামান্য হাত খরচ বাদ দিলে তার চেয়ে বেশি টাকাই জমবে হাতে। তাছাড়াও লোক চক্ষুর আড়ালে থাকার পক্ষে এমন একটি পাণ্ডব বর্জিত গ্রাম কোথায় পাবে সে কলকাতার আশে-পাশে ?

আরো এক বছর কাটলো সেখানে। তারপর বৃদ্ধ জমিদার চোখ বুজলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে জমিদারের পুত্রটি বখামির চূড়ান্তে গিয়ে পৌঁছিয়ে এক সময় বাধ্য করলো তাকে গ্রাম ছাড়া হ'তে। যাবে কোথায় ? আবার কলকাতা ; ছ'মাস থেকে দুটো টিউশনি ব্যতীত আর কোনো কাজ ছিলো না ; চেষ্টাও করেনি। কেননা নগরের আতঙ্ক তখনো তাকে আচ্ছাদিত ক'রে রেখেছিলো। ট্রামে বাসে ফুটপাতে সর্বত্র তার মনে হ'তো সকলের চোখ তার উপরেই নিবদ্ধ। এমন কি টিউশনির বাড়িগুলোতে ঢুকতেও সেই আতঙ্ক ছাড়তো না তাকে। তারপরেই আসানসোল। আবার তেমনি এক ছোট্ট ইশকুল।

এইখানেই প্রায় দশ বছর বাদে আবার মঞ্জুলার সঙ্গে দেখা। মোটা হয়েছে, বয়েস হয়েছে, সুখের ছাপ পড়েছে সারা শরীরে। যে ইশকুলে সে কাজ নিয়ে গেছে, মঞ্জুলার বাড়ির খুব কাছেই একটি প্রাইভেট ইশকুল, মঞ্জুলার কন্যা সেখানকার ছাত্রী। ছাত্রীর মা হিশেবেই এসেছিলো একদিন, নন্দিনীকে দেখে লাফিয়ে উঠলো, 'তুই ?'

নন্দিনী তাকিয়ে আনন্দিত হ'তে গিয়েও চমকালো, ঢোঁক গিলে বললো, 'হ্যাঁ।'

'কী আশ্চর্য ! তা হ'লে তুই তোর প্রতিজ্ঞা রেখেছিস ? এখনো বিয়ে করিসনি ?'

নন্দিনী আবার ঢোঁক গিলে বললো, 'হ্যাঁ।'

'কী মজা।' নিজের খুশিতেই নিজে মশগুল মঞ্জুলা। ছুটির পরে মেয়েকে নিতে এসে জোর ক'রে তাকেও নিয়ে গেলো বাড়ি। আলাপ করিয়ে দিলো স্বামীর সঙ্গে, মেয়েকে মিস ডাকার বদলে মাসি ডাকতে শেখালো।

নন্দিনী শান্তিমতো বসতে পারছিলো না সেখানে, মনে হচ্ছিলো ওরা জানে, সব জানে, খবরের কাগজে কি বেরোয়নি খবরটা? নিশ্চয় বেরিয়েছে, নিশ্চয়ই এখনো চরেরা ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে তার সন্ধানে। এরা এতো আদর করছে কেন? কেন আসতে বলছে, কেন খেতে বলছে, কেন মঞ্জুলার স্বামী ঘন ঘন তাকাচ্ছে তার দিকে?

কিন্তু কয়েকদিন পরে আস্তে আস্তে কেটে গিয়েছিলো সে ভয়, আস্তে আস্তে পুরোনো বন্ধুতা আবার বিশ্বাস উৎপাদন করতে পেরেছিলো, শেষ পর্যন্ত এটুকু তাদের সে জানতে দিয়েছিলো, চির-কাল যাদের সঙ্গে লড়াই ক'রে ক'রে সে নিজেকে একটা মনুষ্য পদ-বাচ্য ব'লে গণ্য করেছে, এ লড়াইটা তাদের সঙ্গে নয়। এর মূল আরো অনেক গভীরে, আরো অনেক শক্ত। বলা যায় অচ্ছেদ্য।

সেই ভয়ই আজ আবার গ্রাস করেছে তাকে। আবার এতোদিন বাদে। কিন্তু সত্যিই কি কোনো কারণ আছে ভয়ের? তাও কি সম্ভব? না কি চোখের ভুল? মনের ধাঁধাঁ? কিন্তু — কিন্তু — নন্দিনী গা মুছতে মুছতে কেঁপে উঠলো। হাত থেকে প'ড়ে গেলো তোয়ালেটা, কাঁপুনি থামাতে চেষ্টা করতে হ'লো। তারপর ভেজা গায়ে জামা-কাপড় চাপালো।

কিন্তু চিন্তা তাকে ছাড়লো না। ছাদ পেরিয়ে ঘরে এলো সঙ্গে সঙ্গে। কেননা আজই তো প্রথম নয়, দিন তিনেক আগেও চলমান বাস থেকে ঠিক এই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে, আবার আজ। সেদিন নন্দিনী দেখেছিলো ঝাপসা, আজ সে-ও দেখেছে নন্দিনীকে, দেখে একটা ঘোড়ার মতো ছুটে এসেছিল বাসটা ধরবার জন্য, পারেনি। যদি পারতো? আবার কেঁপে উঠলো সে কিন্তু সেই সঙ্গে সহসা একটা আরামও ছড়িয়ে পড়লো মনে। যদি অস্তিত্ব লোপ না পেয়ে থাকে তবে আর এতো ভয় কিসের? 'তা হ'লে আমি যা ভেবেছি তা তো ঠিক নয়।' আশ্চর্য! কী আশ্চর্য! তবে

আর আমি পালিয়ে বেড়াচ্ছি কেন? কোন অপরাধে এই মৃতপ্রায় জীবন। না কি আমি ভূত দেখছি? সত্যিকারের ভূত? না কি আমি চিনতে পারিনি। না কি একই মূর্তির অন্য রক্তমাংস। কী! কী! কী!

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নন্দিনী লম্বা চুলে চিরুনি চালালো, দাঁতে দাঁতে চেপে বড়ো বড়ো দুই চোখের সাদা অংশে লাল ছড়িয়ে এক কঠিন প্রতিজ্ঞায় দৃঢ়বদ্ধ হ'লো, তারপরেই দরজায় টোকা শুনে শক্ত হ'য়ে দাঁড়িয়ে গেলো।

৫

গিয়েছিলো এক চাকরির উমেদারীতে। সেদিনও আজকেও।

এই উমেদারীর পালা কবে যে ফুরোবে কে জানে। কপাল দোষে কোথাও টিকতে পারছে না।

আসানসোল থেকে কী ভাবেই না শেষে পালাতে হ'লো। ঐ একই কারণে। সেবার ছিলো মালিকের ছেলে, এবার মালিক নিজে। পুরুষের তাড়নায় কী অবস্থা মেয়েদের, কী অনিরাপদ জীবন। মঞ্জুলারা যদ্দিন ছিলো, কোনো অসুবিধে হয়নি। মঞ্জুলার স্বামী সেখানকার মস্ত বড়ো চাকুরে, মফঃস্বল শহরে বেশ প্রতিপত্তি ছিলো, আর তার আত্মীয় হিশেবে নন্দিনীও কখনো কোনো অসুবিধার মুখোমুখি হয়নি। ওরা চলে যেতেই এই গোলমাল।

মঞ্জুলাদের পেয়িংগেস্ট হয়েই ছিলো নন্দিনী। ওরা যাবার পরে খুঁজে পেতে ঘর নিতে হ'লো একটা এবং মালিকটি যে মুহূর্তে বুঝতে পারলো সে অভিভাবকহীন তৎক্ষণাৎ তার ভোল পাল্টে গেলো। নানা ছল-ছুঁতোয় ইশকুলের কাজের নাম ক'রে আসতে লাগলো তার ঘরে। প্রথম দিকে নন্দিনীর কিছুই মনে হয়নি, এলে ভদ্রতা করেছে, বসতে বলেছে কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই বুঝে ফেললো এ লোকের

মতলব অন্যরকম। শেষে এমন অবস্থায় পৌঁছোলো ব্যাপারটা, এক রাতে মাইনে না নিয়েই চুপচাপ বেরিয়ে আসতে হ'লো বাড়ি ছেড়ে। গা ঢাকা দিয়ে স্টেশনে এসে বসে থাকলো ট্রেনের আশায়।

কোথাকার ট্রেন?

আর কোথায়? কলকাতা ছাড়া পাপী-তাপী গরীব দুঃখীর আর জায়গা আছে নাকি? আবার এসে উঠলো পূর্ব পরিচিত এক মহিলা নিবাসে, তারপর আবার চাকরির চেষ্টা! এবার কোনো আবাসিক বালিকা বিদ্যালয়ে চেষ্টা করছিলো সে, কেননা এ-রকম ব্যক্তিসর্বস্ব ইশকুলে ঢোকবার আর সাহস ছিলো না। কিন্তু চাকরি কি ইচ্ছে করলেই পাওয়া যায়? নন্দিনীও পায়নি। তিন মাস ব'সে থেকে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে যখন সঞ্চয় ফুরিয়ে এলো, এই সময়ই ডক্টর হৃষীকেশ তালুকদারের বিজ্ঞাপনটি চোখে পড়লো তার।

একাদিক্রমে কলকাতায় তিনমাস বসবাসের ফলে, এবং সাত বছরের প্রলেপে শহরে থাকার ভীতিটা অনেক ফিকে হ'য়ে এসেছিলো। কিছুটা ইতস্তত করেছিলো ঠিকই, তবু একদিন চ'লে এলো দেখা করতে। প্রথমে মাইনের অঙ্কটাই লুব্ধ করেছিলো, কিন্তু দেখা করার পরে জীবনে এই প্রথম সে এমন একজন সুসংস্কৃত সুশিক্ষিত মানুষকে প্রত্যক্ষ করলো, যা শুধু তার কল্পনাতেই ছিলো। বাস্তবে কখনো সে এমন একজন পরিপূর্ণ ভদ্রলোক আর দেখেনি। দু'চারটে কথা বলার পরেই তিনি নিয়োগ করলেন তাকে। মোটা চশমার ফাঁকে শান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, 'তা হ'লে আপনি সব বুঝে নিন, —' মেয়েকে ডাকলেন, 'এ বাড়িতে এই আমরা দু'জন মানুষ, আপনি দায়িত্ব গ্রহণ করলে তিনজন। তবে আমাকে সব কিছু থেকেই বাদ — রাখতে পারেন, মোটামুটি এ ঘরটাতেই আবদ্ধ থাকি আমি, এই স. জগৎ।'

নন্দিনী হাতে হাতে কাজটা পেয়ে একটু হতচকিত হ'য়ে পড়ে- ডক্টর তালুকদারকেও দেখলো, তার মেয়ের দিকেও তাকালো।

ঘর ভর্তি বই বই আর বই। এতো বই একজন মানুষের? এতো বই একজন মানুষ পড়ে, পড়তে পারে?

যে সব মানুষ এতো বই পড়ে, তাঁকে ভয় করবার কোনো কারণ আছে ব'লে মনে হয়নি তার। নইলে সামান্য একটু আলাপের পরেই, (সাক্ষাৎকারটা আলাপের পর্যায়েই রেখেছিলেন তিনি, নিয়োগ কর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হননি) একেবারে কাজে বহাল করার পূর্ব অভিজ্ঞতাবশতঃ মনে খটকা লেগেছিলো বৈকি।

মুনমুন নীল-নীল চোখে তাকিয়েছিলো তার দিকে, চোখে চোখ পড়তেই লজ্জা-লজ্জা ক'রে হাসলো, বুকটা যেন ভ'রে গেলো। আবেগবশতঃ অকৃত্রিম স্নেহে হাত বাড়িয়ে টেনে নিলো কাছে। আর সেই থেকে এই আটমাস এমন একটা অনাবিল শান্তিতে জীবন কেটেছে, যার কোনো তুলনা নেই।

কিন্তু তবু তো এই কাজ ছেড়ে অন্য কাজের চেষ্টা করতে হচ্ছে? কেন? দুর্ভাগ্য ছাড়া আর একে কী আখ্যা দেয়া যায়?

দরজায় আবার টোকা। শক্ত হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকা নন্দিনী এবার কেঁপে উঠলো থর থর ক'রে। ধ'রে ফেলেছে, ঠিক ধ'রে ফেলেছে। ঘরের মধ্যে না থাকলে হয়তো লাফিয়ে পড়তো ছাদ থেকে। কিন্তু এখন তো ছাদে বেরুনো যাবে না, বেরুলেই মুখোমুখি। তা হ'লে? তা হ'লে? তা হ'লে আমি এখন কি করি? বিহ্বল চোখে সে নিস্তার পাবার উপায় খুঁজতে লাগলো।

স্বভাবত সে ভীতু নয়, দুর্বল নয়, কোনো অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করার পাত্রী নয়, নিজের আদর্শবোধের সঙ্গে বিরোধ ঘটলে লড়াইতে পিছপা নয় এবং ছেলেমানুষও নয়। তার বত্রিশ বছর বয়েস হয়েছে, এই বিশ্ব সংসারে ভালোমন্দ চক্রান্ত ষড়যন্ত্র অনেক কিছুর সঙ্গেই অনেক দিন ধ'রে ঘর করতে হয়েছে, হচ্ছে, তবু এই মুহূর্তে হৃদয়ে ভয় ছাড়া আর কোনো বৃত্তিই কোনো কাজ করলো না, ভয়ের সাঁড়াশি কণ্ঠ চেপে তার নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে দিলো।

এইবার টোকার সঙ্গে একটি গম্ভীর সম্ভ্রান্ত গলার আওয়াজও ভেসে এলো, 'এখানে কি অনামিকা মিত্র থাকেন?'

অনামিকা মিত্র! ডুবে যেতে যেতে তীর পেয়ে নন্দিনীর সমস্ত রক্ত তোলপাড় ক'রে মুখে বুকে কানে ছড়িয়ে পড়লো। আসন্ন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়া হিংস্র ভয়ার্ত ভঙ্গি তৎক্ষণাৎ নম্রতায় অবসিত হ'লো। দ্রুত হাতে বেশবাস সামান্য সংস্কার ক'রে প্রায় ছুটে বেরিয়ে এলো সে, 'আপনি! কী আশ্চর্য আপনি!'

ছাদের দরজার ফ্রেমে দাঁড়িয়ে হৃষীকেশ এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিলেন। অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে তিন তলায় উঠে এসে খোলা আকাশের তলাকার এই ছাদের প্রখর আলো তাঁর চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছিলো, নন্দিনীকে দেখে আশ্বস্ত গলায় বললেন, 'তা হ'লে ঠিকই এসেছি?'

'আসুন, আসুন — ঈশ্, এই রোদ্দুরের মধ্যে —' সাদর অভ্যর্থনায় মাননীয় অতিথিকে ঘরের মধ্যে নিয়ে এলো সে, বসবার আসন এগিয়ে দিলো, পাখার স্পীড বাড়িয়ে দিলো, নরম গলায় বললো, 'মুনমুন ভালো আছে?'

হৃষীকেশ ঘরের স্নিগ্ধ ছায়ায় ঠাণ্ডা হলেন, নন্দিনীর লম্বা খোলা ভেজা চুলের দিকে তাকিয়ে, শীতলবোধ করলেন। লম্বা চুলের মেয়ে তিনি অনেকদিন দেখেননি, একটু সময় তাকিয়ে থেকে, মৃদুহাস্যে বললেন, 'কী ক'রে আর ভালো থাকে, বলুন। আপনার বিরহে সে খুব কাতর।'

'আমার বিরহে?' নন্দিনীর চোখের কোলেও একটু হাসি জমলো, 'আমার কথাও বলে?'

'আপনার চিঠিটা পেয়েই আমি চ'লে এলাম —' কোনো ভূমিকা না ক'রে তিনি আসল কথায় আসতে চেষ্টা করলেন, 'আপনি অন্য লোকের কথা লিখেছেন কেন? যদি কোনো কারণে দু'চারদিন যেতে না পারেন বা শরীর খারাপ হ'য়ে থাকে বরং ছুটি নিন না, তা ব'লে একেবারে যাবেন না এই সিদ্ধান্ত নেয়াটা আপনার ঠিক হয়নি।'

এ কথার জবাবে যে কী বলবে সহসা ভেবে পেলো না নন্দিনী, একটু পরে বললো, 'না, আমার শরীর খারাপ হয়নি।'

'তবে?'

'আপনাকে এক গ্লাস সরবৎ ক'রে দি?' অন্য প্রসঙ্গে এলো।

'না।'

'আজ কলেজে যাননি?'

'কলেজ থেকেই আসছি।'

'তা হ'লে এক কাপ চা অন্ততঃ —'

'চা? দেবেন? দিন।' এদিক-ওদিক তাকালেন, 'ঘরখানা তো ভারি সুন্দর।'

'একটাই মাত্র ঘর, এই কোনো রকমে —' নন্দিনী কুণ্ঠিত হ'লো।

'একাই থাকেন বোধহয়।'

'হ্যাঁ, আমি নিতান্তই একা মানুষ।'

'একার পক্ষে চমৎকার। আমার লোভ হচ্ছে। কিন্তু জানি, আমি থাকলে এই ঘরের চেহারা সম্পূর্ণ পাল্টে যাবে।' হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে, 'আজকাল আমার বাড়িটাও বেশ ভদ্রগোছের থাকে, কেন বলুন তো? আপনি গুছিয়ে রাখেন নাকি? আমার হরিচরণ তো এতো লক্ষ্মী নয়।'

নন্দিনী জবাব দিলো না।

'সন্ধেবেলা ছাদটাও নিশ্চয়ই খুব উপভোগ্য হয়?'

'তা মন্দ নয়।'

'এই ছাদ বিষয়ে আমার একটা ভারি সুন্দর স্মৃতি আছে। আগে প্রায়ই নস্ট্যালজিয়া হ'তো, এখন ভুলে গেছি। কতোকাল বাদে আমার মনে পড়লো কথাটা।'

'আপনার ভদ্রতা আপনারই যোগ্য, নইলে আমার এই দীন-বাসস্থানটি নিশ্চয়ই এতো —'

'খুব ভালো, খুব ভালো।' হৃষীকেশ চশমা মুছলেন, 'কিন্তু আমি

আবারো জিজ্ঞেস করছি, 'আপনি কাজটা ছাড়তে চাইছেন কেন? কী অসুবিধে হচ্ছে আপনার?'

'অসুবিধে!' ঢোঁক গিললো, 'না অসুবিধে কেন?'

'তা হ'লে?'

'আমার মনে হয় এই মাইনেতে মুনমুনের জন্য আপনি আরো অনেক বেশি উপযুক্ত লোক পেতে পারেন।'

'সেটা তো আমি বুঝবো', ঈষৎ অসহিষ্ণু ভঙ্গি করলেন তিনি 'এবং বুঝেই নিশ্চয় মেয়েকে আপনার হাতে সঁপে দিয়েছিলাম।'

উত্তরে নন্দিনী খুব সরল ভাবেই বলতে চেয়েছিলো, 'কিন্তু আপনার ভাবী স্ত্রী যে অন্য রকম বোঝেন। তিনি যে আমাকে চান না সেটা তো তিনি গোপন করেননি। তারপরেও আমি কী ক'রে থাকি?'

কিন্তু সে কথা বললো না। কেননা চাকরি ছাড়ার কারণটা এখন আর মুনমুনের পিয়ানোর টিচারটির নানা রকম অবহেলা বা অসম্মান-জনক ইঙ্গিতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, তার চেয়ে আরো অনেক বেশি গভীরে চ'লে গেছে।

কী জবাব দেবে ভাবতে ভাবতেই পোড়া গন্ধে ভ'রে গেলো ঘর। সেই যে নিবু নিবু আঁচে স্টোভ জ্বালিয়ে খিচুরি চাপিয়ে স্নানে গিয়েছিলো, তারপর ভুলেই গিয়েছিলো সে কথা।

'ওমা, কী কাণ্ড —' লাফিয়ে উঠে হাতল ধ'রে নামিয়ে দিলো সস্‌প্যান। এতোক্ষণ চায়ের কথাও ভুলে গিয়েছিলো, স্টোভটা বাড়িয়ে জলটা বসিয়ে দিলো।

হৃষীকেশ বললেন, 'কী হ'লো?'

'কিছু না —'

'কী পুড়ছিলো?'

'ও কিছু না —'

চেয়ারে ব'সে অদূরে নামানো পাত্রে পোড়া ডাল-চালগুলো স্পষ্ট দেখতে পেয়ে সচেতন হ'য়ে বললেন, 'আপনার রান্না নয়তো?'

'ও নিয়ে অত ভাবছেন কেন?'

'আপনার খাওয়া হয়েছে তো?'

'খাবো।'

'তার মানে খাননি?'

'খাবো —'

'এতো বেলায় —'

'একটা কাজে বেরিয়েছিলাম।'

'— এসে রান্না বসালেন?'

'রান্না আর কী? ঐ একটু খিচুরি বসিয়ে স্নান করতে গিয়েছিলাম —'

'আর আমি এসে সেটা পুড়িয়ে দিলাম? ছি ছি —' উঠে দাঁড়ালেন তিনি, 'আমার খুব অন্যায় হ'য়ে গেছে এভাবে কিছু না জানিয়ে, কোনো এ্যাপয়েন্টমেন্ট না ক'রে চ'লে আসা।'

'আপনি অনর্থক ব্যস্ত হচ্ছেন।'

'কিন্তু কী জানেন, মুনমুন কাঁদলো কাল রাত্তিরে এবং আমি জানি তার কারণ আপনি।'

'আমি?'

'অন্য কারণও অবশ্য কিছু ছিলো। ওর পিয়ানোর টিচার ওকে বোর্ডিংয়ে দেবার কথা বলছিলেন। ইদানিং কারণে-অকারণে এতো জেদ মতলব করছে যে, আমারও মনে হয়েছিলো সেটাই সবচেয়ে ভালো। ছোটো তো নেই আর, বোর্ডিংয়ে বেশ ভালোই থাকবে, বন্ধু-বান্ধব হবে। সেই শুনে কান্না আর থামে না। কিন্তু আসল কথা আপনি। আপনি আর যাবেন না জেনেই ওর সবচেয়ে বেশি কষ্ট হয়েছে।'

চোখে জল এসে গেলো নন্দিনীর।

'আর আমিও মেয়ে বিষয়ে এতো দুর্বল! কলেজ গিয়ে সমস্ত সময়টা ওর কান্নার কথাই ভাবলাম, তারপর বলতে পারেন প্রায় অজানিত ভাবেই চ'লে এলাম এখানে। আমি জানি, আমার ওখানকার কাজটা আপনার যোগ্য নয়, তবে এটা খোলা মনেই বলতে পারি, এই

ক'মাসে আপনার প্রতি আমার কন্যাও যেমন আকৃষ্ট, আমিও তেমনি শ্রদ্ধাশীল।'

'শ্রদ্ধা! আমাকে! আমার প্রতি।'

'খুব সঙ্গত কারণেই মনে হয়েছে এই বয়েসটা অন্তত ও যদি আপনার প্রভাবে থাকতে পারে, তা হ'লে আমি যা চাই, অর্থাৎ যে ভাবে যে ধারায় আমি ওকে গ'ড়ে তুলতে চাই সেটা নিজে থেকেই হ'য়ে যাবে।'

নন্দিনী নিস্তব্ধ।

'আমি নিজে যদিও ইংরিজির লোক কিন্তু সংস্কৃতর উপর ঝোঁক আমার বরাবরের এবং আপনার বিষয়ও সংস্কৃত ছিলো। এই হাতেখড়িটাও ওর ভালো হচ্ছে। বানান ভুল করা একটা রোগ ছিলো আগে, আট মাসে তাতে আশ্চর্য উন্নতি করেছে। আপনি যে ওকে ভালোবেসে পড়ান, ভালোবেসে ওর ভালো-মন্দ বিষয়ে আদেশ-নির্দেশ দেন সেটাতেই এই বদল সম্ভব হয়েছে। বুঝতেই পারছেন মাতৃবিছিন্ন শিশু কিছুটা স্নেহ কাঙাল বৈকি।'

নন্দিনী নিস্তব্ধ।

'তাই বলছিলাম যদি কোনো কারণে এখানে কাজ করতে ঘোরতর কোনো আপত্তি আপনার না থাকে তা হ'লে এই মুহূর্তে না ছাড়লে আমি খুব বাধিত হবো।'

তিনি উঠলেন। ইতস্তত ক'রে বললেন, 'আর ঐ মানে আমি আপনার সম্মান মূল্যের কথাটাও বলছিলাম, সেটাও বাড়ানো যেতে পারে।'

নন্দিনীও উঠে দাঁড়ালো, মৃদু অথচ দৃঢ়ভাবে বললো, 'আপনার মেয়েকে আমি আমার চাকরির অন্তর্গত হিশেবে গ্রহণ করিনি। তাকে ছাড়তে আমার কম কষ্ট হচ্ছে না, কিন্তু —'

'কিন্তু কী?' যেতে যেতে ফিরে দাঁড়ালেন।

কেটলির জল ফুটে ধোঁয়া বেরুচ্ছিলো লক্ষ্য ক'রে নন্দিনী বললো, 'একটু বসবেন দয়া ক'রে,' টিপটে জল ঢালতে ঢালতে সনির্বন্ধ

হ'লো, 'আর কখনো দেখা হবে কিনা জানিনা, যদি এক কাপ চা ক'রে খাওয়াবার সম্মতি আমাকে দেন চিরকাল মনে একটা তৃপ্তি থাকবে। বলতে বাধা নেই, আপনার কাছে কাজ করতে গিয়ে, আপনাকে দেখে, আপনার মেয়েকে ভালোবেসে আমি যে জগতে প্রবিষ্ট হয়েছিলুম,এতোকাল সেটা ছিলো আমার কাছে একটা স্বপ্নের ছবি মাত্র। নিঃসংশয়ে জানাই আট মাসের এই ক্ষণিক সংসারযাত্রা আমাকে নরকের অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে এসেছিলো।'

ডক্টর হৃষীকেশ তালুকদার বসলেন। নন্দিনী দ্রুত হাতে তার একক খাবার টেবিলটিতে বিন্যাস ক'রে সুদৃশ্য কাপ প্লেট সাজাচ্ছিলো, সেদিকে তাকিয়ে বললেন, 'ধন্যবাদ। কৌতূহল কোনো সময়েই সমর্থন যোগ্য নয়, তবু আমার একটা কথা জানতে ইচ্ছে করছে — '

'বলুন।'

'মুনমুন বলছিলো, এমিলির ব্যবহার আপনার প্রতি খুব শালীন নয় এবং তার ধারণা আপনি সেই কারণেই কাজ ছাড়তে চাইছেন। কথাটা কি সত্য?'

'অসত্যও নয়। তবে এই মুহূর্তে সে কারণটা একান্তই গৌণ কেননা এই মুহূর্তে আমি যে ভয়ঙ্কর এক বিপদের সম্মুখীন হয়েছি, তাতে আর একদিনও আমার কলকাতার বসবাস নিরাপদ নয়।'

চায়ের কাপ এগিয়ে দিলো সে, প্লেটে কিছু বিস্কুট ও দু'টি সন্দেশ।

হৃষীকেশ বললেন, 'এ সব কী?'

নন্দিনী হাসলো, 'এসব আমার দুর্ভাগ্যের নমুনা। ঘরে কি কিছু থাকে যে দেবো?'

'আমি সকালে খেয়েছি, দুপুরে খেয়েছি, এখন বৈকালিক ভোজনে আপনি প্রলুব্ধ করছেন। অথচ আপনার নিজের এখনো পর্যন্ত দ্বিপ্রাহরিক আহারটুকুও সমাধা হয়নি। আমি ততোটা অবিবেচক নই যে এ অবস্থায়ও খুব নির্লিপ্ত ভাবে এই সব আহার্যের সদ্ব্যবহার করবো।'

'আমিও সকালে খেয়েছি, ভাববেন না অনশনে আমার খুব

আগ্রহ। খাবো নিশ্চয়ই, তবে আপনার মতো অতিথিকে যে যোগ্য সমাদর করবার সাধ্য হ'লো না সেটাই দুঃখের। আপনি খান, চা তো আমিও নিয়েছি।'

'আপনার রান্নাটা কি একেবারে নষ্ট হ'য়ে গেছে?'

'ওটা নিয়ে ভাববেন না।'

'তা হ'লে যেটা নিয়ে ভাবছি, সেটাই বলি।'

'কী ভাবছেন?'

'কলকাতার বসবাস আপনার নিরাপদ নয় বললেন কেন? কী আপনার বিপদ? আমি কি কোনো রকম সাহায্যে লাগতে পারি?'

'সাহায্য?'

'ক্ষমতা নিশ্চয়ই সীমিত, তবু জানতে পারলে —'

'জানতে পারলে আপনি এক্ষুনি এখান থেকে উঠে চ'লে যাবেন।'

'বলতে বাধা আছে কোনো?'

'বাধা?' মাটিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলো, 'আমি মুনমুনের হিতাকাঙ্ক্ষী, আপনারও হিতাকাঙ্ক্ষী। বাধা থাকলেও আপনাকে বলা উচিত, কিন্তু কী বলবো, কী ভাবে বলবো, অথবা কতোটা বলবো সেটা ঠিক বুঝতে পারছি না।'

একটা শব্দ হ'লো বাইরে, সঙ্গে সঙ্গে নন্দিনী কথা থামিয়ে চায়ের বাসন-টাসন উল্টে একেবারে অন্য মানুষ হ'য়ে উঠে দাঁড়ালো। পর মুহূর্তেই লজ্জিত হ'য়ে বললো, 'কাকটা বালতি ঠুকরোচ্ছে।'

৬

চা শেষ করলেন হৃষীকেশ, সন্দেশ এবং বিস্কুটের প্লেট অস্পৃশ্য রইলো। কিন্তু চা শেষ ক'রে তিনি উঠলেন না। ভয় পেয়ে অস্থির ব্যবহার করার পর থেকে সংকুচিত নন্দিনীর দিকে তাকিয়ে ধীর গলায় বললেন, 'আপনি কি এখন আমার সঙ্গে যাবেন?'

চমকিত হ'য়ে নন্দিনী বললো, 'কোথায় ?'

'আমার বাড়িতে ?'

'কেন ?'

'ওখানে নিরাপদ বোধ করতে পাবেন।'

'কেন ? এখানে আমার কিসের ভয় ?'

'যে ভয়ে আপনি এইমাত্র ওবকম চমকে গেলেন, যে ভয়ে কলকাতা ছাড়তে চাইছেন।'

'আমি কলকাতা ছাড়তে চাইছি ? কেন চাইছি ?' তাব চোখেব তাবা ব্যাকুল হয়ে উঠলো, বড়ো বড়ো কবে তাকালো সে।

'কেন চাইছেন বলুন তো।'

'যদি খববেব কাগজে কখনো কিছু দেখে থাকেন, জানবেন সেটা ভুল।' স্বর কেঁপে গেলো তার।

চুপ ক'রে কী চিন্তা করলেন হৃষীকেশ, পকেট থেকে পাইপ বেব ক'রে দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে খুঁচোতে খুঁচোতে বললেন, 'ভুল কি ঠিক সেটা বুঝবো কী ক'বে ?'

'তার মানে আপনি সব জেনে শুনেই আমাকে কাজ দিয়েছিলেন ?'

'তা তো নিশ্চয়ই। না জেনে না বুঝে কি কাবো হাতে কোনো পিতা তার সন্তানের ভার দেয় !'

'কাগজে আপনি কি দেখেছিলেন ? ক'দিন আগে দেখেছিলেন ?'

কথাবার্ত্তার মোড় যে এভাবে এদিকে গড়িয়ে আসবে, হৃষীকেশ স্বপ্নেও ভাবেননি সে কথা। বুঝতে পারলেন না কী জবাব দেবেন। কিন্তু ধরা দিতেও ইচ্ছে করছিলো না, তাঁর জানতে ইচ্ছে করছিলো, এমন চমৎকার একটি মেয়ের এই নিঃসঙ্গ জীবনযাত্রা আজ কোন ভয়াল গুহার তিমিরে নিমজ্জিত।

'ডক্টর তালুকদার —

'বলুন।'

'আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, আজ আমি কতোটা উদ্‌ভ্রান্ত,

তা নৈলে খবরের কাগজে যদি আপনি কিছু দেখেও থাকেন তা হ'লেওবা আমাকে সনাক্ত করবেন কী হিশেবে? আমি তো আপনার কাছে আমার সঠিক পরিচয় দিয়ে কাজে ঢুকিনি।'

হৃষীকেশ তাকালেন, তাকিয়ে থাকলেন। কিন্তু সম্বিৎ ফিরেছে নন্দিনীর। ভয়ের বদলে একটা অদ্ভুত সাহস ফিরে এসেছে তার মনে, তার সবল চরিত্র তাকে বহুকাল বাদে আবার ফিরিয়ে এনেছে তাব আসল ব্যক্তিত্বে। তার মনে হচ্ছে, যে কোনো কারণেই হোক কোনো মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে কাজ করাটা অত্যন্ত গর্হিত। বিশেষত যে তাকে বিশ্বাস করে, শ্রদ্ধা করে, এবং যে তার সন্তানের দায়িত্ব পালন করতে দিয়েছে তার কাছে·····।

'আপনাকে আমার জানানো উচিত —'

জানলার বাইরে ধু-ধূ আকাশে তাকালো সে, 'আমার আসল নাম নন্দিনী নন্দী।'

'ও,' হৃষীকেশ তার পাইপে তামাক ভরছিলেন।

'নন্দী পদবী আমার পিত্রালয়ের, মিত্র পদবী আমার বিবাহের দ্বারা।'

'বিবাহ! আপনি বিবাহিত?'

'আপনার কাছে কাজ নেবার সময় আমি যে দুটো মিথ্যে কথা বলেছিলাম, তার একটা হ'লো এই যে আমার অনামিকা নাম আমার আসল নাম নয়, এবং আমি মিস মিত্র নই, মিসেস মিত্র।'

'কারণটা জানতে পারি কি?'

'নিশ্চয়ই। আপনি যদি অধৈর্য না হন, আপনাকে আমি সব কথাই বলতে পারি।'

'অধৈর্য কেন হবো।'

'খৃষ্টান ধর্মে আছে মৃত্যুর আগে মানুষ পুরোহিতকে তার সব কথা অকপটে ব'লে যায়, হিন্দু ধর্মে গঙ্গা স্নান ক'রে পাপ ধুয়ে ফ্যালে? গঙ্গা স্নানে আমার বিশ্বাস নেই, সব পুরোহিতেও বিশ্বাস নেই, কিন্তু আপনার প্রতি আছে।'

'আমার অনেক ভাগ্য।'

'ভাগ্য আমারই। দৈবাৎ আপনার দেখা না পেলে এই স্বীকৃতিতে আমি কখনোই উদ্বুদ্ধ হতাম না, বাকী জীবন সাপের ভয়ে একটা ইঁদুরের মতো কেবল এই গর্ত থেকে ঐ গর্ত, আর সেই গর্ত থেকে সেই গর্তে লুকিয়ে পালিয়েই দিন কাটতো। ভয় আমাকে একটা পিশাচের মতো আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছিলো।'

হৃষীকেশ পাইপে আগুন দিলেন।

প্রায় ফিস ফিস ক'রে নন্দিনী বললো, 'আমি আজ সাত বছর যাবৎ একটা খুনের আসামী হ'য়ে পলাতক।'

'খুন!' চমকে উঠলেন হৃষীকেশ, আবার উচ্চারণ করলেন, 'খুন?'

'ঘৃণা করতে চান করুন, পরিত্যাগ ক'রে এই মুহূর্তে চ'লে যেতে চান যান, কিন্তু যা সত্য তা সত্য। এবং সত্য ব'লেই যে আমি অতি পাপিষ্ঠ তাও আমি স্বীকার করি না।'

হৃষীকেশ ন'ড়ে চ'ড়ে বসলেন।

চুপ ক'রে থেকে শান্ত গলায় বললেন, 'আপনার আত্মীয়-পরিজনরা কোথায়?'

'জানি না।'

'স্বামী?'

'আমি তাকেই আজ দেখেছি, তার ভয়েই আমি এই শহর ছাড়তে উদ্যত হয়েছি, প্রত্যেকটি শব্দে যে এমন বিচলিত হ'য়ে পড়ছি তার কারণও ঐ মানুষটিই।'

'তাঁর সম্পর্কে আপনার এতো ভয়?'

'কতো ভয় তার কোনো মাপ নেই।'

'তিনি কি জানেন আপনি এখানে আছেন?'

'না।'

'তবে কী ক'রে আসবেন?'

'তার অসাধ্য কোনো কর্ম নেই। এই নিয়ে তাকে আমি দু'দিন দেখলাম।'

'তিনিও আপনাকে দেখেছেন ?'

'প্রথম দিন দেখেন নি, আজ দেখেছেন।'

'আপনি কোথায় তাকে দেখলেন ?'

'একটা চাকরির ইনটারভিয়ু দিয়ে ফিরে আসছিলাম, প্রথম দিনও তাকে যেখানে বাসের জন্য দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি, আজও সেখানেই দাঁড়িয়েছিলো। হঠাৎ চোখাচোখি হ'য়ে গেলো।'

'তারপর ?'

'তারপর সে দৌড়োলো বাসের পিছনে পিছনে, ছেড়ে দিয়েছিলো উঠতে পারলো না।'

'তিনি আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন ব'লে আপনার ধারণা ?'

'সেই আশঙ্কাই করছি।'

'তার মানে এই পলাতক জীবনের ঠিকানা তাঁরও অজানা।'

'হ্যাঁ।'

'আপনি চান না তিনি জানুন।'

'না না।'

'তা হ'লে কি তিনিই আপনাকে ধরিয়ে দেবেন ?'

'না, ধরিয়ে দেবার আর কোনো প্রশ্ন নেই, ধ'রে নিয়ে যাবার প্রশ্ন।'

'কাকে ?'

'আমাকে।'

'আপনাকে কোথায় ধ'রে নিয়ে যাবেন ?'

'তার বাড়িতে।'

'আপনি সে বাড়িতে আর ফিরে যেতে চান না ?'

'অসম্ভব।'

পাইপের আগুন ইন্ধনের অভাবে নিবে গিয়েছিলো, সেটা হৃষীকেশ উজ্জীবিত করলেন, বললেন, 'আপনার পিতামাতা আছেন ?'

'যখন পালিয়েছিলাম, তখন ছিলেন, এখন আছেন কিনা জানি না। এই সাত বছর আমি তাঁদের কোনো খোঁজই করিনি।'

'তাঁরাও করেননি ?'

'তাঁবা কী ক'রে করবেন ! কী ক'রে জানবেন আমি কোথায় ?'

'তা হ'লে আপনি এখন কী করতে চান ?'

'এখুনি এ বাড়ি ছেড়ে চ'লে যেতে চাই।'

'কোথায় ?'

'যেখানে হোক।'

'আপত্তি না থাকলে আমাব বাড়িতে একটা ঘর নিয়ে থাকতে পাবেন।'

নন্দিনী বেদনাহত বিস্ময়ে অভিভূত হ'য়ে বললো, 'কী বলছেন ! একটা খুনী মেয়েকে আশ্রয় দিতে আপনার ভয় নেই ? দ্বিধা নেই ?'

'দ্বিধা নেই কিছু, তবে ভয় একটু আছে, যদি রক্ষা কবতে না পাবি !'

'দ্বিধা নেই !'

'এজন্যই নেই, আপনাকে দেখে যতোটা চিনেছি, আপনি কোনো অন্যায় কাজ করতে পাবেন ব'লে মনে করি না। যদি কিছু ঘ'টে থাকে তা হ'লে ঘ'টে গেছে বলেই ঘটেছে। আমি তো সব শুনিনি, সব জানি না, যদি একটু শান্ত হ'য়ে বলেন, আপনাব জন্য যা করবার সব আমি করবো।'

দু'হাতে মুখ ঢাকলো নন্দিনী। ভাঙা ভাঙা গলায় বললো, 'তবে শুনুন, সব শুনুন, সব শুনে আমাকে বিচার করুন, দয়া করুন, ক্ষমা করুন।'

৭

এর পরে হৃষীকেশ যা শুনলেন, তা হ'লো, এই গড়মিলটা ওদের প্রথম থেকেই ছিলো। কিন্তু কেউ গ্রাহ্য করলো না। নন্দিনীর বাবা সন্তোষ নন্দীও না, মা নিভাননীও না, ঠাকুমা বিনোদিনীও না। এমনকি

ভাইয়েরাও কেউ নন্দিনীর সপক্ষে দাঁড়ালো না। শুধু নন্দিনীই একা একা যুদ্ধ চালিয়ে এক সময় ক্লান্ত হ'য়ে ভাবলো, একটা অস্তিত্বের কী এমন মূল্য যা নিয়ে জীবনপাত করা চলে।

জীবনপাতই বটে। বাড়ীর কারো সঙ্গে কোনো ব্যাপারেই কোনো দিনই তো মতৈক্য ঘটে না, এটাও যে ঘটবে না সে কি তার অজানা ছিলো? তবে আর কেন এই পণ্ডশ্রম। নিজেকে সে একেবারেই অদৃষ্টের হাতে ছেড়ে দিয়েছিলো তারপরে।

সত্যি বলতে ঐটুকু জীবনের মধ্যে শুধু তো এটাই নয়। এই বিবাহই নয়, আরো, আরো আরো অনেক লড়াই চালাতে হয়েছে। প্রত্যেক পদক্ষেপে সে টের পেয়েছে, এ বাড়িতে যে আধারে তার জন্ম, মাপে সে তার চেয়ে এতো অনেকটাই বড়ো যে এরা, এই পরিবারের মানুষেরা যারা তার পিতা মাতা ভ্রাতা ভগ্নি এবং পিতামহী নামে চিহ্নিত তাঁরা কিছুতেই আর তাকে চেপে চুপে ঠেসে থিতিয়ে ভিতরে ভ'রে রাখতে পারছেন না।

তার পিত্রালয়টি একান্তভাবেই সেকেলে। মা তাঁর নামটাও সই করতে পারতেন না। মানুষ ভালো ছিলেন, সরল স্বভাবের ছিলেন। ঠাকুমা তো আরো অন্ধকারে। বলা যায় পরিবারটির মধ্যে তখনো এক ফোঁটা সভ্যতার আলো প্রবেশ করেনি। তাদের জীবন দর্শন কেবল দেশাচার আর লোকাচারেই সীমাবদ্ধ ছিলো। তাঁরা না মানতেন এমন কোনো কিছুই নেই। হাঁচি টিকটিকি ব্রাহ্মণ শূদ্র হিন্দু মুসলমান কায়স্থ বৈদ্য পুরুষ স্ত্রীলোক ছোটো বড়ো ধনী দরিদ্র পূজা পার্বণ প্রায়শ্চিত্ত গো-মাতা প্রতিটি সংস্কারের প্রতি তাঁদের অচলা ভক্তি, অদম্য বিশ্বাস।

ভাঁড়ার ঘরের ঝাপসা কোণে তাঁদের পুজোর জায়গা তেত্রিশ কোটি [illegible]ীর ছবিতে আকীর্ণ, ফাঁকে-ফোকরে আবার তারি সঙ্গে 'যখন [illegible]' মহাত্মা গান্ধী এবং সিনেমা থিয়েটারের নট-নটিরাও

এই সাত বছ

সহাস্যে সমাসীন। শোবার ঘরে উনিশটা ক্যালেণ্ডার পানের দোকানের মতো উনিশ রকম ভঙ্গিতে লটকে থাকে। গামছার মতো চৌখুপী রঙিন মশারি তার বিবর্ণ চেহারা নিয়ে সর্বক্ষণ তক্তাপোষের উপর দোদুল্যমান আর তক্তাপোষটি বিছানা গুটিয়ে সম্পূর্ণ অনাবৃত। দুর্গন্ধ ময়লা কাপড়ের ডাঁই ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। ভাঁড়ার ঘরে একটি সরকারী আলনা সর্বদাই ভারবাহী থাকলেও ঘরে ঘরে দড়ির আলনাও কম ভারাক্রান্ত নয়। তার উপর আছে ট্রাঙ্কের সারি, খাটের তলায় পৃথিবীর জঞ্জাল। ওদিকে রান্নাঘরের কাঁচা মাটি সর্বদাই জলে জলে থকথকে। সুচীবায়ুগ্রস্ত মা ঠাকুমা কেবলই হাত ধুতেন, ধুয়ে ধুয়ে যতো পরিষ্কার হ'তে চাইতেন, ততোই আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে হাজা ভর্তি হ'য়ে যেতো। তার উপরে মস্ত শিলনোড়াতে দলা-দলা মশলা বাটা হচ্ছে ঘসর ঘসর ক'রে হাতের চেটোয় কড়া প'ড়ে গেছে।

ভারিভারি বাঁঠাল কাঠের পিঁড়ি পেতে ব'সে সেইখানেই খায় তারা, প্রথমে পুরুষেরা পরে মেয়েরা। খেয়ে কাপড় ছাড়ে। এই হচ্ছে জীবন ধারণের নমুনা।

কাপড় অবিশ্যি অনেক বারই ছাড়তে হয়। সেটা মেয়েদের বেলাতেই শুধু প্রযোজ্য এবং বিবাহিত মেয়েদের বেলায়। ছেলেদের সাত খুন মাপ।

ঠাকুমা ছেলেদের বেলায় বলেন, 'সোনার আংটি আবার বাঁকা কী?' মেয়েদের বেলায় বলেন, 'ইঃ মেয়ে হ'য়ে জন্মেছে তার আবার অত।'

নন্দিনীর নাম আগে ছিলো কুন্দনন্দিনী, সেটাকেই সে বড়ো হ'য়ে ছেঁটে কেটে শুধু নন্দিনী করেছে। এই নাম নিয়েও যুদ্ধ হয়েছে ঢের। কিন্তু সেটা তার দ্বিতীয় যুদ্ধ। প্রথম যুদ্ধ হয়েছিলো ছ'বছর বয়সে ইশকুলে ভর্তি হওয়া নিয়ে। নন্দিনীরা তিন বোন তিন ভাই। প্রথমে বড়ো বড়ো দুই দিদি, কবে বিয়ে হ'য়ে গেছে তাদের। সর্দা আইনকে কলা দেখিয়ে দু'জনকেই চোদ্দ না পুরতেই পিঁড়িতে বসানো

হয়েছিলো। সেই দিদিদের তখন তার সমান সমান ছেলে মেয়েতে ঘর ভর্তি। দিদিদের পরে পর পর তিন দাদা, ছোটো দাদাটির সাত বছর বাদে সে নিজে।

অর্থাৎ মা বাবার বেশ বেশি বয়সের সন্তান সে, এবং যেহেতু তারপরে তাঁদের আর কোনো সন্তান আসেনি, সুতরাং আদরটা কিছু বেশি ছিলো। দাদা দিদিরাও এই বোনটিকে নিয়ে যথেষ্ট মোহিত, আর বৃদ্ধা ঠাকুমার তো নয়নের মণি।

সুতরাং যুদ্ধ করতে হ'লেও এই আদরের জন্য জয়ীও হ'তে পেরেছে অনেক বার।

দিদিদের বিদ্যা বলতে গেলে একশোটি বাক্যে নব্বুইটি বানান ভুল ক'রে দু'চারখানা পত্র রচনাতেই সীমাবদ্ধ, স্ত্রীলোকের আর কী দরকার? মিশ্র যোগটা শিখিয়ে দিতে হবে বাজারের হিসেব নেবার জন্যে, আর চিঠি লেখার মতো বিদ্যার দরকার স্বামীর কাছ থেকে দূরে থাকলে খবরা-খবর এবং প্রেম নিবেদনের কারণে। ব্যস, আবার কী?

একবার বড়ো জামাইবাবুর কাছে লেখা বড়দির একখানা চিঠি দেখেছিলো নন্দিনী। বড়ো জামাইবাবু ওষুধের দালাল। যখন তখন যেখানে সেখানে চ'লে যেতে হয়। যাবার সময় দিদিকে তাঁর পিত্রালয়ে অর্থাৎ নন্দিনীদের বাড়িতে রেখে যান। আর তখনি দিদি বিরহে কাতর হ'য়ে গোলাপী কাগজে আতর ঢেলে রোজ রোজ চিঠি লেখেন। নন্দিনী যেটা দেখেছিলো, তাতে লেখা ছিলো, 'প্রাণেশ্বর, তোমা বিহনে আমি পিন্‌যরা বদ্‌ধো পাখির ন্যায় ছটফট করিয়া জিবণ যাপন করিতেছি। সারাদিন তবু এক রকমে কাটিয়া যায় কিন্তু রাত্‌রি নয় তো যেন যোম। একা বিছানায় কতো যে কষটো হয় তাহা আর লিখিয়া বোঝানো সম্ভব নয়, তুমি নিজে বুঝিয়া লইও।'

জামাইবাবু কী বুঝেছিলেন তা তিনিই জানেন, নন্দিনী হাসতে হাসতে ম'রে গিয়েছিলো। সে তখন ক্লাশ টেনের ছাত্রী, প্রথম ছাড়া দ্বিতীয় হয় না। দিদি জামাইবাবুরা বলেন, 'কী রে কুন্দ, লেখাপড়া

শিখে শেষে তোর দাড়ি গজাবে নাকি? তারপর কাছা কোচা দিয়ে আপিশের বাবু হবি।' একথা শুনেও তেমনিই হাসি পেয়েছিলো তার।

বাবা ছিলেন আসামের কোনো এক ছোটো শহরে চা বাগানের হাতুড়ে ডাক্তার। নাম সন্তোষচন্দ্র নন্দী, দেশ পূর্ববঙ্গে। সন্তোষ নন্দীর পিতা ভবতোষ নন্দী এবং মাতা বিনোদিনী অতি অল্পবয়সেই আদর ক'রে বিয়ে দিয়েছিলেন ছেলেকে। কিন্তু জীবিকার সংস্থান ছিলো না কোনো। যদ্দিন ভবতোষ নন্দী জীবিত ছিলেন চলছিলো কোনো রকমে। কিন্তু গাঁয়ের জমিদার বাড়ির গোমস্তাগিরি করতে করতে কখন একদিন চোখ বুজলেন তিনি, তারপরেই সন্তোষ একেবারে আতান্তরে প'ড়ে গেলেন। ম্যাট্রিক পাশ ক'রে বছর দেড়েক ঢাকার মেডিকেল ইশকুলে পড়েছিলেন, এটুকু বিদ্যা সম্বল ক'রে প্রথমে নিজের পিতৃভূমিতে বসেই প্র্যাকটিস সুরু করেছিলেন, জমলো না। সেখানে সরকারী হাসপাতাল ছিলো, বিনা পয়সায় সরকারী ডাক্তার ছিলো, একজন ভালো কবিরাজ ছিলো, কেউ আর পয়সা দিয়ে তাই সন্তোষ ডাক্তারকে ডাকতো না। শেষে কবে যেন কার পরামর্শে আরো অনেক পূর্ববঙ্গীয় বাঙালীর মতো নিদানের বিধান আসামের এক চা বাগিচাতে এসে হাজির হলেন। কয়েকদিন একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে কাটলেও মাস কয়েকের মধ্যে জ'মে গেলো ডাক্তারী। কুলিদের ম্যালেরিয়া হ'তো, কালাজ্বর হ'তো, আর তিনি দোহাত্তা কুইনিন চালাতেন, ইনজেকশন ফুটোতেন। কারো জীবনেরই কোনো দাম ছিলো না সেখানে। বাঁচলে বাঁচলো, মরলে মরলো। কিন্তু উপার্জন হ'তো খুব। অবোধ শিশুর মতো লোকগুলো ডাক্তারবাবুকে মনে করতো দেবতা। হাতা কাঁথা বিক্রী ক'রে হ'লেও চিকিৎসা করাতো তারা আর রোগ তো তাদের আছেই লেগে। ডাক্তারের কাছে আসারও বিরাম নেই। শিশুগুলো জন্মিয়েই রোগের কবলে পড়তো, পেটভর্তি প্লীহা যকৃতের কারখানা শেষ ক'রে দিতো তাদের। সন্তোষ ডাক্তার

চিকিৎসা করতে করতে নাওয়া খাওয়ার সময় পেতেন না, পয়সাও আসতো পকেট ভর্তি।

এক বছরের মধ্যেই নিয়ে এলেন দুই মেয়ে সহ মাকে আর স্ত্রীকে। এখানে এসে আর সবাই জন্মালো।

৮

সন্তোষ নন্দী নির্দয় ছিলেন না, চশমখোর বা অর্থ গৃধ্নুও ছিলেন না। দয়া দাক্ষিণ্য ছিলো। অনেক সময়ই অনেক দুঃস্থ রোগীকে বিনা পয়সায় চিকিৎসাও করতেন। আরো একটা গুণ এই ছিলো যে কিছুটা পড়াশুনোও করতেন। ডাক্তারি বিদ্যার মোটা মোটা সব বই, যা পাঠ্য ছিলো, সেগুলো তাকে তুলে না রেখে অবসর মতো পড়তেন সেগুলো। বিদ্যা বাড়ানোর দিকে ঝোঁক ছিলো তাঁর। এমন কি এক সময় এ-কথাও ভেবেছিলেন সুযোগ সুবিধে হ'লে পাশটা ক'রে নেবেন। বলাই বাহুল্য সেটা হয়নি। সংসারের দায়িত্ব নেবার আর তো কেউ ছিলো না? উপরন্তু এতোগুলো সন্তান।

ভেবে ভেবে প'ড়ে প'ড়ে ওষুধ দিয়ে অনেক সময় অনেক শিশুকে রক্ষা করেছেন তিনি, অনেক মা বাবার চোখের জল নিবারিত করেছেন। তাছাড়া ব্যবহার ছিলো অতি আপনজনের মতো। বিরক্তি নামক একটা জিনিশই ছিলো না চরিত্রে। সেজন্য সবাই ভালবাসতো। কুলীরা এই ডাগদার ছাড়া অন্য ডাগদারের কথা চিন্তাই করতে পারতো না। অবশ্য অন্য ডাক্তার আর কে বা ছিলো!

নন্দিনী যতোদিন শিশু ছিলো তাদের কোলে কাঁখে উঠে অনেক আবদার করেছে। এতোদিন বাদে আবার ডাগদার বাবুর ঘরে নতুন শিশু দেখে খুশি হয়েছে তারা। নতুন খোকীকে কী দিয়ে কী করবে ভেবে পায়নি। কেউ চিঁড়ে কুটে এনে দিয়েছে, কেউ মুড়ি ভেজে এনে দিয়েছে, গাছের ফল এনে দিয়েছে কেউ, এমনি ক'রে করেই

বড়ো হ'য়ে উঠেছে নন্দিনী। এই আদরে। সন্তোষবাবু মেয়েকে বুক থেকে নামাননি, যা চেয়েছে দিয়েছেন প্রাণপাত ক'রে, যেমন চেয়েছে তেমনই দিয়েছেন।

কিন্তু তাই ব'লে সে যে ছ' বছর বয়সে ইশকুলে ভর্তি হ'তে চাইবে তা অবশ্য তিনি ধারণাও করতে পারেননি।

আর সেই চৌহদ্দিতে ইশকুলই বা কোথায়? ছেলেরাই যায় তিন মাইল দূরে কোথায় হেঁটে হেঁটে, তার আবার মেয়েদের ইশকুল!

নদীর ধারে একটি মিশনারি বিদ্যালয় আছে বটে, সে হ'লো গিয়ে রুই কাৎলাদের জন্য। সাহেব সুবোদের ছেলেমেয়েরা পড়ে সেখানে, আর এক দু'জন তাদেরি সমকক্ষ কোনো বাবু ভুঁইয়াদের সন্তান।

সেখানে তো আর একটা সামান্য সন্তোষ ডাক্তারের মেয়েকে ভর্তি করার প্রশ্ন ওঠে না। সন্তোষ ডাক্তারের সাহস কী যে এই প্রস্তাব নিয়ে গিয়ে দাঁড়াবেন সেখানে? আর মাইনে কতো! তাই কি দিতে পারেন নাকি তিনি? পারলেই বা একটা মেয়ের পিছনে অত খরচ করবেন কেন?

কিন্তু করতে হ'লো। আদরের কুন্দনন্দিনী তার রাঙা ঠোঁট ফুলিয়ে ফর্সা মুখ লাল ক'রে বড়ো বড়ো চোখে অথৈ জলের পাথার বইয়ে দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বললো, 'দাদারা ইশকুলে যায়, আমিও যাবো।'

সকলে অবাক। বলে কী মেয়ে? এ কোন সৃষ্টিছাড়া কথা? ঠাকুমা বললেন, 'দাদারা আর তুই কি এক হ'লি নাকি? ওরা হ'লো গিয়ে পুরুষ মানুষ, ওরা লিখবে পড়বে চাকরি ক'রে টাকা আনবে ঘরে, যেখানে খুশি সেখানে যাবে, যা খুশি তাই করবে। আবাগীর বেটি তাদের সঙ্গে তোর কী শুনি? তোর সাতকুলে কোন মেয়ে ইশকুলে গেছে। যাদের পরিবারে মেয়েছেলের মুখ চন্দ্র সূর্য দেখলেও অসম্মান, সেই তুই যাবি ঐ খৃস্টানগুলোর সঙ্গে ঢলাঢলি করতে? তা হ'লে জাত জন্মের আর বাকি থাকবে নাকি কিছু?'

থাকে থাকবে না থাকে না থাকবে, তার দায়িত্ব ছ'বছরের মেয়ের নেবার কথা নয়। তা সে নিলোও না। সমানে কান্নাকাটি করতে লাগলো। দাদাদের দেখে দেখে শুনে শুনে শিখেও ফেললো অনেকটা। কিন্তু তাতে তার তৃপ্তি কই? পড়াশুনো করবার অদম্য ইচ্ছে কেবলি উতলা ক'রে তোলে। সুতরাং আবদারও থামে না। তারি মধ্যে একদিন জ্বর হ'লো খুব। বাড়ি সুদ্ধু সবাই অস্থির হ'য়ে উঠলো। দূরের শহর থেকে পাস করা ডাক্তার এনে দেখানো হ'লো, তবু জ্বর ছাড়ে না। এক রাত্রে মা বাবার ব্যাকুল মুখের দিকে তাকিয়ে নন্দিনী ঘোষণা করলো, 'আমাকে ইশকুলে দাওনি বলেই আমার জ্বর হয়েছে। যদি ইশকুলে ভর্তি করো তা হ'লে জ্বর সেরে যাবে, নইলে ম'রে যাবো।'

রুগ্ন মেয়ের মুখে এ কথা শুনে মা ঠাকুমা কাঁদতে বসলেন, বাবার মুখ বিষণ্ণ হ'য়ে উঠলো, দাদারাও বিচলিত হ'লো। শেষে বড়দা বললো, 'তোমরাই বা জেদ করছো কেন? আজকাল কতো মেয়ে লেখাপড়া শিখছে, তাতে কী হয়েছে? তারা কি খারাপ হ'য়ে গেছে? না কি তাদের বিয়ে হয়নি।'

ঠাকুমা চোখ মুছে বললেন, 'খারাপ না হোক, মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে নির্ঘাৎ বিধবা হয়।'

'মোটেও না।'

'তুই তো কতো জানিস।'

ছোড়দা বললো, 'দাও দাও, চাইছে তো ভর্তি করে দাও, যাক না দু'দিন সখ মিটলে আপনি পালাবে।' বোনকে ভয় দেখিয়ে বললো, 'জানিস তো পড়ায় না পারলে কী রকম ছড়ি দিয়ে মারে ওখানে? কী রকম কান ধরিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখে? আবার গাধার টুপি মাথায় দেয়, কপালে ইঁট দিয়ে সূর্যমুখী ক'রে শুইয়ে রাখে — আরো কতো কী করে —'

কুন্দনন্দিনী বললো, 'যারা পারে না তাদের করে, আমাকে করবে না। আমি রোজ পড়ায় পারবো।'

'যদি একদিনও না পারিস তা হ'লে ও — '

ছোট্ট কুন্দনন্দিনী জ্বরতপ্ত দুর্বল শরীর ঝাঁকিয়ে কান্নার সুরে বললো, 'আমি রোজ পারবো, রোজ পারবো, রোজ পারবো।'

'তবে যা পার গিয়ে — ', রণে ভঙ্গ দিলো ছোড়দা। কিন্তু বাবা চোখ মুছিয়ে সোনা লক্ষ্মী ব'লে সান্ত্বনা দিলেন, 'ঠিক আছে, কেঁদো না, ভালো হ'য়ে ওঠো আমি নিশ্চয়ই তোমাকে ভর্তি ক'রে দেবো।'

সত্যিই দিলেন। ভয়ে জড়োসড়ো হ'য়ে একদিন সেই সাহেব মেমদের ইশকুলেই নিয়ে গেলেন মেয়েকে, ফিরে এলেন খুশি হ'য়ে। ইশকুলের সিস্টাররা তার দিকে তাকিয়ে হেসেছেন, গুড আফটার নুন বলেছেন, কুন্দনন্দিনীকে আদর করেছেন। তবে আর কথা কী? এক লাফে অনেক উঁচুতে উঠে গেলেন তিনি। বেশ গৌরব বোধ হ'লো। মাকে স্ত্রীকে অগ্রাহ্য ক'রে বলতে লাগলেন, 'আরে হাজার হোক সাহেবের জাত, তাদের ব্যবহারই আলাদা, দেখো, কুন্দ আমাদের একদম মেম সাহেবের মতো হ'য়ে যাবে।'

তা অবশ্য হ'লো না তবে পড়াশুনোয় ভালো হ'লো খুব। ক্লাশ ফোরের পরে ছোট্ট একটা বৃত্তিও পেলো। যার ফলে সন্তোষ বাবুকে আর মাইনেও টানতে হ'লো না। আর সেই যে ভর্তি হ'লো ছাড়লো একেবারে ম্যাট্রিক পাশ ক'রে।

আসামের ঐ পাণ্ডব বর্জিত এক ছোট্ট শহরে ঐ প্রথম একজন মেয়ে ম্যাট্রিক পাশ করার সৌভাগ্য অর্জন করলো তাও আবার প্রথম বিভাগে। তখনো একটি বৃত্তি পেলো, এবং সেই বৃত্তিও ইশকুলের ফাণ্ড থেকেই দেয়া হ'লো। যদি ম্যাট্রিক পাশের পরেও পড়াশুনো করতে চায়, তা হ'লে দু'বছর পর্যন্ত এই ফাণ্ড মাসে মাসে তাকে পনেরো টাকা ক'রে দেবে।

ইশকুলের সিস্টাররা কুন্দনন্দিনী উচ্চারণ করতে ঘেমে যেতেন। কুণ্ডননন্ডিন বলতেন কোনো রকমে ঠেকে ঠুকে। ছ' বছরের মেয়ে

সাত বছরে পৌঁছেই একদিন বললো, 'সিস্টার আমাকে শুধু নন্দিনী বোলো।'

বড়ো সিস্টার খুব ভালোবাসতেন, হেসে বললেন, 'শুধু নণ্ডিন?'

'হ্যাঁ, শুধু নন্দিনী।'

'কুনডুন বলতে হবে না?'

'না, কুন্দ বলতে হবে না।'

ভাঙা ভাঙা বাংলা বলতে শিখেছিলেন তিনি। কুন্দনন্দিনীর পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, 'তা হোলে সেটো বেশ কোঠা।'

সেই থেকে সে নন্দিনী হ'লো। আর ইশকুলের পরে বাড়ি এসে যখন সগৌরবে জানিয়ে দিলো সে কথা, ঠাকুমা থুথু করতে লাগলেন, চিৎকার ক'রে বলতে লাগলেন, 'ওরে সন্ত ভালো চাস তো জাত জন্ম খোয়াবার আগে এখনো মেয়েটাকে ছাড়িয়ে আন। নইলে অনেক দুঃখ আছে কপালে।'

মা-ও মাথায় হাত দিলেন। মেয়ে যে দিনকে দিন সত্যি কেমন স্বেচ্ছাচারী হ'য়ে উঠছে একথা অনুভব ক'রে শঙ্কিত বোধ করলেন।

তারপর হঠাৎ গালে প্রচণ্ড জোরে একটা চড় মেরে বললেন, 'অসভ্য মেয়ে, আহ্লাদে একেবারে মাথায় চড়েছে। মা বাবার রাখা নামেও তার মন উঠছে না, সেখানেও সর্দারি। খোদার উপর খোদকারী — ' বলতে বলতে ক্ষিপ্ত হ'য়ে চড় থেকে কিল, কিল থেকে ধাক্কা। ধাক্কা থেকে ইশকুলে যেতে দেবেন না ব'লে প্রতিজ্ঞা ইত্যাদি ক'রে একেবারে হুলুস্থুল বাঁধিয়ে দিলেন।

সাত বছরের মেয়ে হতচকিত হ'য়ে প্রথমে কাঁদতে ভুলে গেলো, তারপরে কান্নাটাকে অপমান জ্ঞানে ঢোঁক গিলে নিবারিত করলো। এবং গুরুজনেরা যতোই তুলকালাম করতে লাগলেন সে তার কুন্দনন্দিনী নামের অপভ্রংশ নন্দিনী নামে ততোই স্থির হ'য়ে থাকতে লাগলো।

যে যাই বলুক, নামটা তো তার নিজেরই, নিজের জিনিশ নিয়ে নিজে সে যা ইচ্ছে তা করতে পারে বৈকি। 'তোমার নাম কী?' এ

কথাটা তো লোকেরা তাকেই জিজ্ঞেস করবে, তার মা বাবা ঠাকুমা দাদাদের নিশ্চয়ই নয় ; আর জবাবও তাকেই দিতে হবে। অতএব তার পছন্দের মূল্য আছে নিশ্চয়ই।

সেই যুক্তিতেই সকলের বকা ঝকা শাসন নির্যাতন সব কিছু উপেক্ষা ক'রে কেউ নাম জিজ্ঞাসা করা মাত্র জবাব দিত নন্দিনী নন্দী। নন্দিনীর পরে নন্দীটা উচ্চারণ করতে তার ভারি ভালো লাগতো। জিবে একটা আরাম পেতো। বড়ো হ'য়ে জানলো এর নাম অনুপ্রাস। অনুপ্রাসের মজা।

ম্যাট্রিকের ফল সেই নন্দিনী নন্দীর নামেই ছাপ মেরে বেরুলো। যদিও সন্তোষবাবু ইশকুলে গিয়ে এই নাম নিয়ে অনেক বলা কওয়া ক'রে এসেছিলেন, যেন কুন্দ শব্দটা কিছুতেই না ছেঁটে দেয়া হয় সে কথা ব'লে এসেছিলেন তবু দেখা গেলো শেষ পর্যন্ত সে কথা তারা রাখেননি। নিশ্চয় মেয়ের ইচ্ছে অনুসারেই রাখেননি আর তা ছাড়া নন্দিন বলতেই সুবিধে পেতেন, তাতেই অভ্যস্ত হ'য়ে গিয়েছিলেন, আস্তে আস্তে কখন সেই নামই বহাল হ'য়ে গিয়েছিলো। কুন্দটা জন্মের মতো মুছে গেলো।

৯

এর পরের যুদ্ধ হ'লো কলেজে ভর্তি হওয়া নিয়ে। না, এখন আর মেয়ে তাঁদের ছোটো নেই, অত প্রশ্রয় দেবার কারণ নেই কোনো। ছেলে বেলায় যা চেয়েছিলো ইচ্ছেয় হোক, অনিচ্ছেয় হোক স্নেহবশত দেয়া হয়েছে, অবশ্য ফল তাতে খারাপ হয়নি তেমন। বরং লোকেরা বেশ একটু সমীহের চোখে দেখে এখন তাদের। দল বেঁধে মেয়েকে আঙুল দিয়ে দেখায়। এতে সন্তোষবাবু তো বটেই পরিজনেরাও মন্দ তুষ্ট হন না। অহংকারে সুড়সুড়ি লাগে।

তা ব'লে কলেজে পড়া? সে কখনো হয়? সেটা কোনোমতেই সম্ভব নয়। এ বিষয়ে বাড়ির প্রত্যেকেই এবার যথেষ্ট দৃঢ় হলেন। নন্দিনীর কান্নাকাটি জেদ আব্দার যুক্তি সব ধুলিসাৎ ক'রে দিলেন দুই ধমকে। দিদি জামাইবাবুরাও এসে গেলেন নিরস্ত করতে, বললেন, 'তুই কি পাগল নাকি? এ নিয়ে অমন করছিস কেন? একা একা কোথায় পড়তে যাবি তুই? তুই মেয়ে মানুষ না?'

মেয়েমানুষ মেয়েমানুষ মেয়েমানুষ! এই এক রব এই বাড়িতে। মেয়েমানুষ যে কী আলাদা বস্তু এ কথাটা কখনোই ভেবে পায় না নন্দিনী।

বড়দি বুঝিয়ে বললেন, 'বয়েস তো তোর কম হ'লো না, এই বয়সে আমার দুটো ছেলে হ'য়ে গেছে, এ সব করা আর তোকে মানায় না।'

সজল চোখে তাকিয়ে নন্দিনী বললো, 'কী সব করা?'

'এই যেখানে-সেখানে গিয়ে পড়তে চাওয়া। মা বাবার কথা না শোনা —'

'আমি তো মা বাবার কথা শুনি — আর যেখানে-সেখানে পড়তে চাইবো কেন? কলকাতা কি যেখানে-সেখানে?'

'বলিস কী তুই? কলকাতা যেখানে-সেখানে নয়? ঐ শহরে নিত্য তিরিশ দিন কতো কাণ্ড ঘটছে তা জানিস? কোনো মেয়েছেলের চরিত্র ঠিক থাকে সেখানে গেলে?'

এরপরে নন্দিনী চুপ ক'রে থাকাই সমীচীন মনে করলো।

চুপ ক'রে থাকতে দেখে বড়দি ভাবলেন, ওষুধে ধরেছে, একটু মিষ্টি দিলেন, 'যদি বা এখানে কলেজ-টলেজ থাকতো না হয়, চেষ্টা ক'রে দেখা যেতো। আমিই মা বাবাকে বুঝিয়ে-টুঝিয়ে ঠিক রাজি ক'রে দিতাম —'

নন্দিনী চুপ।

'তা হ'লে এ নিয়ে আর মা বাবার মনে কোনো কষ্ট দিসনা কেমন?'

'কী নিয়ে?'

'এই পড়ার কথা-টথা নিয়ে।'

সংক্ষেপে নন্দিনী বললো, 'কলেজে আমি ভর্তি হবোই। আমি কলকাতা যাবো।'

'হবিই?' বড়দি চ'টে গেলেন। 'তোর গোঁ তুই কোনোমতেই ছাড়বি না?'

'ছাড়বে কি ছাড়বে না সে আমি দেখবো।' পাখার বাট নিয়ে মা বেগে এগিয়ে এলেন, রক্তচক্ষু হ'য়ে বললেন, 'নচ্ছার মেয়ে, জ্বালিয়ে খেলো সবটা নিয়ে। ছোট্ট থেকে কেবল যা ইচ্ছে তাই। আমি প্রতিজ্ঞা করছি তিন মাসের মধ্যে যদি তোর বিয়ে না দিই তবে যেন গো মাংস খাবার পাপ লাগে আমার।'

স্ত্রীর রাগ দেখে মেয়ের প্রতি করুণা হ'লো সন্তোষবাবুর। মিন মিন ক'রে কিছু বলতে গিয়েছিলেন, স্ত্রী কন্যাকে ছেড়ে স্বামীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন, 'এই তুমি, তোমার জন্যেই আজ মেয়ের এই দশা। তোমার আহ্লাদেই এ রকম মাথায় উঠেছে।'

সন্তোষবাবু হেসে ঠাট্টা ক'রে স্ত্রীকে শান্ত করতে চেষ্টা করলেন, 'দশাটা কী খারাপ, বলো? মেয়ে কি আমাদের মুখ হাসিয়েছে? এই এক লেখাপড়া শিখতে চাওয়া ছাড়া আর কিছু চেয়ে কি কখনো বিরক্ত করেছে?'

স্ত্রী সে কথায় কান দিলেন না, অনবরত বকাবকি করতে করতে রান্না ঘরে ঢুকে গেলেন।

মেজ মেয়ে এসব নিয়ে বেশী মাথা ঘামাচ্ছিলো না, এই পড়াশুনোর প্রতি কোথায় তারও একটা দুর্বলতা ছিলো অল্প বয়েসে, এই বোনের মতো জেদ থাকলে সে-ও হয়তো এ রকম পাশ-টাশ ক'রে বেরুতে পারতো। নিজের থেকে পনেরো বছরের বড়ো এক বুড়ো স্বামীকে বিয়ে ক'রে সুখী হয়নি সে। তার উপরে বছর বছর ছেলে পুলের যন্ত্রণায় বেঁচে থাকতে এক বিন্দু ভালো লাগে না। সে একটু পক্ষ নিলো। বললো, 'ও যদি তখন জোর ক'রে ইশকুলে ভর্তি না হ'তো এতোদিনে আমাদের দশাই হ'তো। কেন মা

তুমি এতো চ্যাঁচামেচি করছো? অতবড়ো মেয়েকে অত বকছোই বা কেন?'

মা মুখিয়ে উঠলেন মেজ মেয়ের উপর, 'কেন, তোমরা মন্দটা আছো কী শুনি? মেয়ে মানুষের জীবন এই রকমই।'

'কেবল বাসন মাজা, কাঁথা কাচা, হেঁসেল ঠ্যালা, পতি পরম গুরুর পদ-সেবা, না?'

মা বললেন, 'হ্যাঁ তাই।'

মেজ মেয়ে মাথা নাড়লো, 'না মা শুধু তাই নয়, দেখো, নন্দিনীর কেমন ভালো বিয়ে হয়, কেমন বিদ্বান বর আসে। এই পাশটুকুর জোরে ওর অনেক ভালো ঘরে বিয়ে হবে, আমাদের মতো চিরদাসীর জীবন আর যাপন করতে হবে না।'

সন্তোষবাবু এ কথায় খুশি হলেন। ছোটো মেয়ের উপর তার দুর্বলতা অদম্য। যদিও তাঁর নিজেরও ইচ্ছে নয়, মেয়ে আবার পড়াশুনোর জন্য একা কলকাতা যায়। তবু এই ধরণের গাল মন্দ করতে তার আটকায়। বললেন, 'তুই ঠিক বলেছিস বিন্দু, সুন্দরী মেয়ে, ম্যাট্রিক পাশ, ওকে তো রাজা রাজড়ার ঘরে লুফে নেবে।'

নন্দিনী বললো, 'তা হ'লে দেখা যাচ্ছে বিয়ের বাজারেও লেখাপড়ার দাম আছে। মেয়েদের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্যই যখন ভালো বর পাওয়া, আর সেই ভালো বর পেতে গেলে যখন লেখাপড়া তার সহায় তখন তো—'

এবার ঠাকুমা উগ্র হ'য়ে উঠলেন, 'বেহায়া, নির্লজ্জ, তুই এতো খৃষ্টান হ'য়ে গেছিস যে নিজের বিয়ের কথা নিজে বলতে তোর একটু লজ্জা হ'লো না? আমি আবারো বলছি সন্তু, এই মেয়ে নিয়ে তোর কপালে অনেক দুঃখু আছে। তুই এখনো সাবধান হ, সাবধান হ, নইলে দেখবি আর বাগ মানাতে পারবি না। এই মেয়ে আর সোয়ামীর ঘর করতে পারবে না। ঘটক লাগা, ঘটক লাগা — ঘটক লাগিয়ে সম্বন্ধ খুঁজে এক মাসের মধ্যে বিয়ে দিয়ে দে।'

শেষে তাই লাগানো হ'লো। সন্তোষবাবু লাগালেন না, তাঁর বড়ো ছেলে সুবোধ ধ'রে নিয়ে এলো কোথা থেকে। সে তখন ওভারসিয়ারী পাশ ক'রে পি, ডাব্লিউ, ডি, তে কাজ করছিলো, এই ঘটক ক'দিন থেকে তার পিছনেই লেগেছিলো, রোজই কোনো না কোনো মেয়ের ফটো দেখিয়ে লুব্ধ করার চেষ্টায় গলদঘর্ম হচ্ছিলো, এই সুযোগে সুবোধ তাকে বোনের জন্য কাজে লাগিয়ে দিলো।

ঘটক এসেই গড়গড়িয়ে অন্তত পঁচিশটা সোনার টুকরো পাত্রের খোঁজ দিল, ভাই বোনের বদল সম্বন্ধের বুদ্ধিও দিলো। তারপর দুপুর বেলা ষোড়শোপচারে থালা ভর্তি তিনজনের মতো ভাত খেয়ে চ'লে গেলো। তারপর আবার দু'দিন বাদে এলো, এবং এই যাওয়া-আসা চলতেই থাকলো।

এবার নন্দিনী চ্যাঁচামেচি সুরু করলো। এই ঘটকের ব্যাপারটা তার এতো অপমানজনক মনে হ'লো যে মা বাবা ঠাকুমা দিদি দাদা প্রত্যেকের সঙ্গে আলাদা আলাদা তর্ক করলো, ঝগড়া করলো, যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করলো, কিন্তু কিছুই ফল হ'লো না। বরং ঘটকের আনাগোনা তাতে আরো ঘন ঘন হ'লো, এবং সত্যিই একমাসের মধ্যে প্রায় ঠিক হ'য়ে গেলো কথাবার্তা। অবশ্য কথাবার্তা ঠিক হওয়া মানেই বিয়ে নয়, বিয়ে হ'তে গেলে সর্বপ্রথম মেয়ে দেখার ব্যাপারটাই আসল। তবে মেয়ে যখন সুন্দরী তখন ঘটক সেটা নিয়ে ততো ব্যস্ত হ'লো না, আগে দেনা পাওনাটা ঠিক ক'রে নিয়ে বললো এবার মেয়ে পছন্দ হ'লেই ব্যস —

এখানেই বাঁধলো মুশকিল। সাজিয়ে গুছিয়ে এই মেয়েকে কে উপস্থিত করবে? কারো কথা শোনার পাত্রী নাকি সে? তবু চেষ্টার ত্রুটি হ'লো না। মা ঠাকুমা পিঠে হাত বোলালেন, বড়দি সোনালক্ষ্মী বললেন, মেজদিও বললো, 'যা না বাপু একবার বোস গিয়ে, দেখলেই যে বিয়ে হ'য়ে যাবে তাতো নয় —' কিন্তু কোনো রকমেই তাকে কেউ রাজি করাতে পারলো না। শেষে একটা ফাঁকির বন্দোবস্ত করা

হ'লো। নন্দিনীকে নিয়ে দিদিরা নদীর ধারে বেড়াতে গেলো একদিন আর সেখানে গিয়েই মুখোমুখি হ'য়ে গেলো পাত্র পক্ষের সঙ্গে। বড়দি ফিস ফিস করলেন, 'অবাধ্যতা করিস না, অসভ্যতা করিস না। মা বাবার নাম ডোবাস না —'

কোথা থেকে সন্তোষবাবু এসেও হাজির হলেন, সুবোধও এলো, ঘটকও উপস্থিত। সে-ই নিয়ে এসেছে পাত্র পক্ষকে। একেবারে জম-জমাট ব্যাপার। বলে এনেছে, বাড়ি গিয়ে পরে জলযোগ করবেন, কিন্তু আমি আপনাদের একেবারে ঘরোয়া চেহারায় মেয়েকে দেখিয়ে দেবো। তাতে কোনো মেকি সাজ গোজের কারচুপিও চলবে না আর না জানা থাকলে মেয়েও ভান ক'রে চুপচাপ নিজের স্বভাব লুকিয়ে বসে থাকতে পারবে না, যেমন মেয়ে ঠিক তেমনি দেখতে পাবেন। প্রস্তাবটা পাত্র পক্ষের পছন্দ হয়েছিলো। সন্তোষবাবু গরীব নন, মেয়ের বিয়েতে ভালোই খরচপাতি করবেন, সুতরাং সেদিক থেকেও পাত্র পক্ষ খুবই লাভবান হবেন ব'লে আশা করছিলেন। তাঁদের কোনো চাহিদাতেই কন্যাপক্ষ না বলেননি, এবার মেয়ে দেখেও তাদের পছন্দ হ'য়ে গেলো।

নদীর ধার থেকে বাড়ি এলো সবাই। খাওয়া-দাওয়া হ'লো, আলাপ-আলোচনা হ'লো, নন্দিনীও কোনো রকম অভদ্রতা করলো না সবই সুন্দর ভাবে সুচারু ভাবে সমাধা হ'য়ে গেলো। আর সব হ'য়ে যাবার পরে সবাই যখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লো তখনই নন্দিনী আবার পূর্ব জেদে ফিরে গিয়ে বললো, 'মিছি মিছি এসব চেষ্টা কোরো না, বিয়ে আমি করবো না।'

'মানে?'

'আমি কলকাতা গিয়ে কলেজে ভর্তি হবো।'

'আমরা সেটা হ'তে দেবো না।' এটা বড়দির গলা।

'কেন?'

'না।'

'তোমরা তো আমার সুখের জন্যই সব করছো, তবে যাতে আমার সবচেয়ে সুখ সেটাতে এতো বাধা দিচ্ছ কেন?'

'সুখ-দুঃখের কথা তোর চেয়ে আমরা বেশী ভালো জানি।' এটা মার গলা।

নন্দিনী বাবার দিকে তাকালো সমর্থনের জন্য। বাবাও দৃঢ় ভাবে বললেন, 'না।'

'দাদা তুমি আমার পক্ষে দাঁড়াও।'

'না।'

'মেজদি — '

'আমি কী বলবো, আমার কতোটুকু বুদ্ধি বা ক্ষমতা?'

এরপরে নন্দিনী বললো, 'আমি খাবো না।'

'ক'দ্দিন খাবি না?'

'যতোদিন না তোমাদের মত পাই।'

রেগে গিয়ে বড়দি বললো, 'ও, যতীন দাসের মতো আমরণ অনশন? ওসব ন্যাকামো ঢের দেখা আছে। না খায় না থাক। তোমরা খেয়ে নাও, কতোক্ষণ আর থাকবে? শেষে তো লুকিয়ে হেঁসেলে ঢুকবে।'

ছোটো মেয়ের বিষয়ে বড়ো মেয়ে যতো সহজে রায় দিলো, মা কিন্তু সেটাকে ততো সহজ ভাবলেন না। এই মেয়ের কাঠিন্য তাঁর অজানা নয়, সে যে ভাঙ্গে তো মচকায় না সে কথা বড়ো মেয়ে সিন্ধু আর কতোটুকু জানে? গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বোঝাতে বসলেন তিনি। চোখের জল ফেললেন, রাগারাগি করলেন, শেষে হাল ছেড়ে দুপদাপ ক'রে খাওয়া-দাওয়া মিটিয়ে শুয়ে পড়লেন সেদিনের মতো।

পরের দিনও ঠিক তেমনিই গেলো, আবার বোঝাতে বসলো সকলে মিলে। সন্তোষবাবুর কখনোই তেমন রাগ হয় না মেয়ের উপর। বরং কেমন কষ্ট হয়। তাঁর মনে হয়, আর তো কিছু না, পড়তে চেয়েছে, এটা কী এমন অন্যায় কথা? ছেলেরা চাইলে কি তিনি নাচতে নাচতে মত দিতেন না! শুধু মেয়ে বলেই তো এতো কথা? সুতরাং বোঝাতে গিয়ে

তিনি কোনো যুক্তি দিয়েই ঘায়েল করতে পারলেন না। 'মা ঠাকুমা এতো বকাবকি করলেন যে তাতে ফল আরো খারাপ হ'লো, আর তারপর দাদারাও কম ধমকালো না, স্নেহশীলা বড়দিও ধৈর্য হারালেন। শুধু মেজদিই চুপ। বরং তার চোখে প্রশ্রয়ের অংশই স্ফুরিত হ'লো বেশী।

এই ক'রে তৃতীয় দিনেও যখন সে একবিন্দু আহার্য গ্রহণ না ক'রে তেমনিই নিঃশব্দে বিদ্রোহ চালাতে লাগলো, তখন থম থম করতে লাগলো সারা বাড়ি।

নন্দিনী যে শুধু সকলের ছোটো এবং সকলের চেয়ে সুন্দর ব'লেই আদরের ছিলো তাই নয়, তার বুদ্ধি, ফুর্তি নম্রতা বাধ্যতা হাসি গান গল্প সব দিয়েই সে ভ'রে রাখতো বাড়িটা। বাবার গলা জড়িয়ে ধ'রে আদর করতো, মাকে চুমু খেতো, ঠাকুমাকে খ্যাপাতো, দাদাদের সঙ্গে ক্যারামের প্রতিযোগিতায় জয়ী হ'য়ে ফিস্ট আদায় করতো — বলতে গেলে পরিবারের সমস্ত নিয়ম ভাঙা একটা মূর্তিমান আনন্দময় বিদ্রোহ। নন্দিনীর অস্তিত্বটাই ছিলো বাড়ির আলো। সেই মেয়ের এই অবস্থা কারো কাছেই সুখের মনে হ'লো না। সকলেরই চোখে-চোখে যেন একটা কী অলিখিত ইঙ্গিত ঘোরা ফেরা করতে লাগলো। চতুর্থ দিনে আর পারলেন না সন্তোষ ডাক্তার, মেয়ের মুমূর্ষু নিস্তেজ উপবাসক্লিষ্ট চেহারার দিকে তাকিয়ে তাঁর বুক ব্যথা করতে লাগলো।

হঠাৎ তিনি সরবে বলতে লাগলেন, 'আমি কিছু মানি না, ষোলো বছর উত্তীর্ণ হয়েছে ব'লেই যে মেয়েকে তার অমতে অনিচ্ছায় যার-তার গলায় ঝুলিয়ে দিতে হবে তার কোনো মানে নেই। পড়তে চাইলে পড়াবো, কী হয়েছে তাতে? বিলেতে মেমসাহেবরা পুরুষদের সমান সমান লেখাপড়া করে, সেজন্য কি তাদের জীবন দুঃখে কাটে? না হয় আমার মেয়ের কোনদিনই বিয়ে হবে না, ইশকুলের শিক্ষয়িত্রী হবে সে। আমি বলছি, নিজে নিয়ে গিয়ে ওকে কলকাতার কলেজে ভর্তি ক'রে দিয়ে আসবো। কারো কথা মানবো না। লোকে যদি নিন্দে করে করুক। যদি সমাজ আমাকে জল চল না রাখতে চায় না রাখুক, আমি আর কিছু পরোয়া করি না।'

এই ঘোষণায় সারাবাড়ির লোক চমকে উঠে গুঞ্জন সুরু করলো বটে, তবে যতোটা হট্টগোল হওয়া স্বাভাবিক ততোটা নয়। ততোটা কেন, তার সিকি ভাগও নয়। ঠাকুমা ঠোঁট উল্টে নিজের কাজে মন দিলেন, মা হঠাৎ গিয়ে বলা নেই কওয়া নেই, সরবৎ তৈরি করতে বসলেন, বড়দি দাদারা আলোচনায় মুখর হ'লেও গলায় জোর লাগলো না তেমন, মেজদি তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে বোনের কানে কানে বললো, 'তুই তো মেয়ে মানুষের জীবন চাসনি, মানুষের জীবন চেয়েছিস, আদায় করতে কিছুটা তেল লবণ লাগবে বৈকি। ভাগ্যিস বাবা তোকে এতো ভালোবাসেন, নৈলে ঐ কালো মোটা হোৎকা বরটার সঙ্গে ঠিক বিয়ে হ'য়ে যেতো, উপোস ক'রে ম'রে গেলেও কেউ দেশাচার লোকাচারের বাইরে পা বাড়াতো না। অতএব —

১০

অতএব নন্দিনী কলকাতা এলো, এর ওর সুপারিশে, এর-ওর পরামর্শে ভর্তি হ'লো লেডি ব্রেবোর্ণ কলেজে, প্রথম বিভাগ পাওয়ায় ভর্তি হ'তে কষ্ট হ'লো না কোনো। সেই কলেজের হস্টেলেই থাকার বন্দোবস্ত হ'লো।

দু'বছর বাদে আবার সে প্রথম বিভাগ পেয়ে আই. এ. পাশ করলো। শুধু প্রথম বিভাগই নয়, প্রথম দশজনেরও একজন হ'লো।

এবার সমাদর হলো বাড়িতে। ততোদিনে আসামের ঐ ছোট্ট অন্ধকার শহরেও কিছুটা আধুনিকতার আলো ঢুকেছে, আরো দু'চার জন বাঙালী অনুপ্রাণিত হ'য়ে তাদের কন্যাদেরও লেখাপড়া শেখাতে উদ্যোগী হয়েছেন, শোনা যাচ্ছে সবাই মিলে একটা ছোটো ইশকুল করার চেষ্টাও করছেন সেখানে।

সমাদর হবার শুধু সেটাই কারণ নয়, কাগজে ছবি বেরুলো নন্দিনীর। আর সেই ছবি দেখেই সকলে কেমন ভড়কে গেলো। বুঝে

নিলো এই মানুষ শুধু মেয়ে মানুষ নয় আর পাঁচজন মানুষের মতো নয়, এ আলাদা।

পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি আসার পরেই কলকাতা নিবাসিনী, অন্য ধরণের সাজ সজ্জায় এবং চলনে বলনে অভ্যস্ত এই বিদুষী মেয়েটিকে কেমন সমীহ ক'রে চলছিলো সবাই, পরীক্ষার ফল বেরুবার পরে তা শতগুণ বর্ধিত হ'লো।

এরপরে সে বি. এ. এম. এ. পড়বে, জজ ব্যারিস্টার হবে কি বিলেতেই চলে যাবে এ নিয়ে আর মাথা ঘামালো না কেউ। মেয়ের ইচ্ছের উপরই ছেড়ে দিলো সব। এবং এই একটা, মাত্র এই একটা ব্যাপারই জীবনে প্রথম অতি মসৃণভাবে সমাধা হ'লো। নন্দিনী আরো দু'বছর কলকাতার জলবায়ুতে অভ্যস্ত হ'য়ে অনার্স নিয়ে বি. এ. পাশ ক'রে দিগগজ হ'লো।

কিন্তু পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি এসেই আবার একটা যুদ্ধ বেঁধে গেলো। এই যুদ্ধটা অবশ্য অপ্রত্যাশিত। এই যুদ্ধটা গান শেখা নিয়ে। গানের গলা তার চিরদিনই পাখি। বাড়িতে একটি ভাঙা গ্রামোফোন ছিলো ছেলেবেলায়, কিছু পুরোনো রেকর্ডও ছিলো তাঁর সঙ্গে। কবে যে কোন সখে সন্তোষবাবু এই চুঙ্গিওলা গ্রামোফোনটি কিনেছিলেন কে জানে। দাদারা বাজাতো, ব'সে ব'সে নন্দিনী হাঁ ক'রে শুনতো। আবার কচি গলায় গেয়ে উঠতো মাঝে মাঝে। তখন সবাই কী খুশি! কতো প্রশংসা, এমন সুন্দর সুর আছে ব'লে। তখনকার দিনের বিখ্যাত গায়ক গায়িকার সব বিখ্যাত রেকর্ড। যেমন মোনতা নামে এক গায়কের 'প্রাণেশ্বরী বদন তোল ছাখো তোমার কে এসেছে', অথবা রমনী চ্যাটার্জির, 'কা রাঁধন রেঁধেছ দিদি চচ্চরি', তারপর জহরা বাঈ, জানকী বাঈ। তার পরবর্তী যুগে জ্ঞান গোঁসাই, আঙ্গুর-বালা, ইন্দুবালা—এঁদের সব গান এক সময় কণ্ঠস্থ ছিলো নন্দিনীর। তাছাড়া যখন যেখানে যা শুনতো তাই তুলতো গলায়। কলকাতা বাসের প্রথম দু'বছরে নয়, বি. এ. পড়তে গিয়ে হঠাৎ সেই পুরোনো

ঝোঁকটা আবার ঝালিয়ে এলো এক বন্ধুর কৃপায়। মেয়েটি অপূর্ব গান করতো, সারা বোর্ডিং মুগ্ধ হ'য়ে যেতো সে গান ধরলে। নন্দিনীর তো কথাই নেই। একই ঘরে থাকতো তারা, মেয়েটি এসেছিলো লক্ষ্ণৌ থেকে, বাবা সরকারী চাকুরে, বদলী হয়েছেন কোথায়, মেয়েকে বি. এ. পড়তে রেখে গেছেন কলকাতা।

তার কাছে অনেক গান শিখে ফেললো সে। অবশ্য তাতে কিছু এসে যেতো না, ঘরের মধ্যে গুণগুণ করলে আর কী আছে? কিন্তু শিখতে চেয়েই মুশকিলটা বাঁধলো। শেখা মানেই তো একটা পেশাদারী ব্যাপার।

আসলে এই শিখতে চাওয়ার ঘটনাটাও অপ্রত্যাশিত। বি. এ. পরীক্ষা দিয়ে আসার পরেই বাবার এক হেলেবেলাকার বন্ধুর সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেলো। বাবা এঁর সঙ্গে ইশকুলে নিচু ক্লাশের সহপাঠী ছিলেন। বাবা যতোদিন এণ্ট্রেন্স পাশ ক'রে ঢাকা মেডিকেল ইশকুলে পড়তে এলেন, ততোদিন তাঁর এই বন্ধু আল মামুদ, গানের গলা সেধে ওস্তাদ মামুদ সাহেবে পরিণত হ'লেন। এমন একটা সময় এলো যখন তাঁর গানের সুবাস তাঁর নিজের গ্রামের গণ্ডি ছাড়িয়ে সারা বাংলার ঘরে ঘরে গিয়ে পৌঁছলো। তারপর একদিন সেই নাম বাংলা ছাড়িয়ে সারা ভারতের বুকে এক আশ্চর্য মোহের সৃষ্টি করলো। গানের জগতের সঙ্গে যারা সম্পৃক্ত তারা তো বটেই, গানের গ-ও যে জানে না, সে-ও এই নাম শুনে চমৎকৃত হ'য়ে বলতো, 'শুনেছি লোকটা নাকি সুরের যাদুকর।'

মাত্র বাইশ বছর বয়েসে একজন বিশেষ মানুষের মর্যাদা নিয়ে শেষে চ'লে গেলেন এক করদ রাজ্যে রাজ দরবারের গাইয়ে হ'য়ে।

এঁর গল্প আগেই অনেক শোনা ছিলো নন্দিনীর। সেই মেয়েটির গলায় এঁর রেকর্ড থেকে তোলা অনেক ঠুংরিও সে শুনেছে। তাছাড়া মানুষটি সম্পর্কে লোকেদের মুখে মুখে অনেক গল্প প্রচারিত ছিলো, প্রায় অলৌকিক গল্পের পর্যায়ে পড়ে সে সব। এই আশ্চর্য সুর-সাধকটির সম্পর্কে যে কতো ভক্তি জমা ছিলো তার মনে তার কোনো

হিশেব নেই। কিন্তু তাঁকে চোখে দেখলো, এতোকাল পরে। এই আসামের এক ছোট্ট শহরের বনের মধ্যে। গান বিষয়ে যখন তার মনে নতুন প্রেম বাসা বেঁধেছে।

শোনা গেল সব ছেড়ে ছুড়ে এখন উনি ফকির হ'য়ে চ'লে এসেছেন এখানে, এই গাড়ো পাহাড়ের অন্তরে। একটা ছোট্ট টিলার ওপরে ছোট্ট কুঁড়ে ঘরে থাকেন, একজন পাহাড়ি মেয়ে কাঠ কুটো জল ফল এনে দেয়, সেবা যত্ন করে, তিনি সারাদিন উপবাসের পর সন্ধেবেলা জলগ্রহণ ক'রে তারপুরো বাজিয়ে ঈশ্বরকে গান শোনান। আর শোনান বনের পশু পাখিকে। আর সেই সঙ্গে সেই নিবেদিত প্রাণ পাহাড়ি মেয়েটিকে।

খবরের কাগজে বছর কয়েক আগে এটা একটা জোর খবর ছিলো যে হঠাৎ সেই করদ রাজ্য থেকে ওস্তাদ আল মামুদখান উধাও হয়েছেন। খোঁজাখুঁজি অনেক হয়েছিলো. কাগজে কাগজে অনেক লেখালেখি হয়েছিলো, কেউ সন্ধান পায়নি। ওস্তাদজির বিখ্যাত শিষ্যরা সেই বছরের শীতে কলকাতার সব বড়ো বড়ো কনফারেন্সে গাইতে বাজাতে এসে ফিস্ ফিস্ ক'রে বলেছিলো, 'এই নিরুদ্দেশের কারণটা যদিও কেউ জানে না কিন্তু আমরা জানি।'

'কী।'

'কী।'

'কী।'

এক সঙ্গে বহু গলার প্রশ্ন সেই শিষ্যদের প্রায় মৌমাছির মতো বেষ্টন ক'রে ধরেছিলো। তারা মুখ চাওয়া-চাওয়ি ক'রে বলেছিলো, 'ঐ আর কি — মানে প্রেম।'

'প্রেম!'

'হ্যাঁ।'

'কার সঙ্গে?'

'বিধবা রাজকন্যা পদ্মাবতীর সঙ্গে।'

'গল্পটা কী বলুন না।'

'সেই পুরোনো থীম।'

'বলুন না।'

'শুনেছি আল মামুদ যখন পরিপূর্ণ যুবক, বাল বিধবা রাজকন্যাও তখন পরিপূর্ণ যুবতী।'

'তারপর?'

'রাজা তার মেয়েকে বৈধব্য ভুলিয়ে দেবার জন্য ছেলের মতো স্বাধীনতায় বড়ো ক'রে তুলেছিলেন। মেয়েকে নিয়ে তিনি দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়াতেন, শিকারে যেতেন, লেখাপড়া শেখাতেন, গান বাজনায় মশগুল রাখতেন। অনেক ওস্তাদ তাঁর দরবারে এসে কুর্নিশ করতেন কন্যাকে, গান শুনিয়ে মুগ্ধ করতে পারলে শিরোপা মিলতো।

সেই সময় আল মামুদ পূর্বের চাকরি ছেড়ে এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। বেড়াতে বেড়াতে এই রাজ্যে এসে হাজির হলেন একদিন। তখন তাঁর নামে সারা ভারত মুখর। পদ্মাবতীর সখ হ'লো গান শুনতে। রাজা হেসে বললেন, 'পাগল হয়েছ?' যে লোকটার বয়েস এখনো তিনদশকে প'ড়ে আছে সে আবার একটা গাইয়ে? ওর সাধন ভজনের সময় হ'লো কবে? চুলে পাক ধরুক, তবে তো। আমার একটা মান সম্মান আছে না? যেখানে ফৈজুদ্দিনের মতো ধ্রুপদী এসে গান শোনায়, নাসেরের মতো খেয়ালী এসে ব'লে যায় এমন শ্রোতা আর পাইনি জীবনে, আলির মতো ঠুংরি গায়ক প'ড়ে থাকে সারাদিন, সেখানে ডাকবো ঐ একটা ছোকরাকে?

পদ্মাবতীর মুখ ভার হ'লো। সে চুপ ক'রে চক্ষুনত ক'রে ব'সে রইলো।

'অমনি রাজা অস্থির হ'য়ে উঠলেন। একে মেয়ে বিধবা, তার উপর মাতৃহীনা, মেয়ের মেঘে ভরা মুখের দিকে তাকিয়ে বুক ফেটে গেলো। সম্মানে একটু লাগলেও একদিন ডাকতেই হ'লো তাকে, একটা আসর বসাতেই হ'লো। ছোকরা এলো। এলোমেলো ধূলি ধূসর উদ্‌ভ্রান্ত চেহারার এক যুবক। শাণিত দৃষ্টি, ঋজু চেহারা, হাসি

অমলিন। এসেই যথাযোগ্য সম্ভাষণ ক'রে নামাজের ভঙ্গিতে ব'সে গড়িয়ে-গড়িয়ে মীড় দিয়ে খাদের গলায় ভীমপলশ্রী ধরলো। মাত্র চারটি পর্দায় গলা রেখে এক ঘণ্টা সে বিস্তার করলো। পঞ্চম নিখাদ সুর আর গান্ধার। তারপর উড়ে উড়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে উঠতে লাগলো উচু পর্দায় — ব্যস। কোথায় লাগে তার পুরার তারের অনুবণন, আর কোথায় লাগে সঙ্গত, ঘরের মধ্যে যেন সহস্র ভ্রমর এক সঙ্গে গমগমিয়ে ফিরতে লাগলো। সেই সুরের জালে সবাই ধরা পড়লো, সকলেরই চোখ ঢুলে এলো, সকলের হৃদয়েই সুর ছাড়া আর কোনো কিছুর অস্তিত্ব রইলো না। রাজকন্যার বুক ভেসে গেল এক পবিত্র দুঃখের কান্নায়।

গান শেষ হ'লে রুদ্ধস্বরে রাজা ব'লে উঠলেন, 'সাবাস'। সভাসদরা বলে উঠলো 'বাহবা, বাহবা'। আর রাজকন্যা চোখের গভীরে তাকালেন। চার চোখ এক হ'য়ে রইলো কয়েক মুহূর্তের জন্য। আর সেই মুহূর্তই প্রেম অক্ষয় হ'লো দু'জনের জীবনে।

'তারপর সেই স্টেটেই স্বেচ্ছাবন্দী হলেন আলমামুদ। সেই ছোটো রাজ্যটুকুর মধ্যেই অতোবড়ো তিনি আবদ্ধ রাখলেন নিজেকে। তাঁর সব সাধন ভজন শিক্ষণ শিষ্য — সমস্ত জগৎটাই এটুকু গণ্ডীর মধ্যে ভ'রে রেখে পরম তৃপ্তিতে দিন কাটাতে লাগলেন।

প্রেম। সাংঘাতিক প্রেম। পদ্মাবতীর সঙ্গে প্রেম। পদ্মাবতী হাতে নাড়া বেঁধে শিষ্যত্ব গ্রহণ করলো তাঁর। পদ্মাবতীর সঙ্গে তাঁর সমস্ত প্রতিভা তিনি ভাগ ক'রে নিলেন। শোনা যায় কোনো এক সন্ধ্যার নির্জনে ওস্তাদের কাছে বসে পদ্মাবতী যখন রেওয়াজ করছিলেন, হঠাৎ সব ফেলে দু'হাতে আলিঙ্গন করলেন ওস্তাদকে, গভীর ভাবে চুম্বন করলেন, তারপর বললেন, 'প্রিয়তম, চললাম।'

হঠাৎ মারা গেলেন পদ্মাবতী। আর সেই থেকে নিরুদ্দেশ হলেন আল মামুদ। হয়তো এ গল্প গল্পই কিন্তু তারপর আর কেউ তাঁর ঠিকানা খুঁজে পেলো না।

১১

নন্দিনীর সঙ্গে বড়ো অদ্ভুত ভাবে দেখা হ'য়ে গেলো। দল বেঁধে সব বনভোজনে বেরিয়েছিলো। এই শহরের এই বনভোজন একটা বিশেষ ব্যাপার। বিশেষ বলাটা হয়তো ঠিক হ'লো না, বলা উচিত এই শহরের এটাই একমাত্র আনন্দ। যে কয়েক ঘর বাঙালী আছে, কোনো না কোনো এক সময়ে সুযোগ সুবিধে মতো বছরে এক আধবার এই বনভোজনের আয়োজন ক'রে বেরিয়ে পড়ে সবাই মিলে। সারাদিন মাতামাতি ক'রে কিছুটা স্বাধীন জীবন যাপনের পরে সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে আসে। প্রকৃতি তার সৌন্দর্যের অঢেল ঐশ্বর্য ঢেলে দিয়েছে সেই শহরটুকুতে, নদী পাহাড় উপত্যকা, ঝর্ণা সবকিছুর সমন্বয়ে চোখ জুড়োনো।

সকাল থেকে মেয়েরা ব্যস্ত হ'য়ে পড়ে রান্না-বান্নার আয়োজনে। যৌথ রান্নাঘরে সকলেই সকলের সখী। ফুর্তি ক'রে কেউ নদীতে কলসী ডুবিয়ে জল আনছে, কেউ উনুন ঠিক করছে, শুকনো পাতা জড়ো করছে কেউ, পুরুষরাও সাহায্য করছে দরকার মতো, বাচ্চারাও খেলতে খেলতে ছুটে আসে, একটা সুখের হাওয়া ছড়িয়ে থাকে দেহে মনে।

বিকেল প'ড়ে এলো, লাল টকটকে সূর্যের আগুন, আটকে থাকলো পাহাড়ের খাঁজে, ঘরে ফেরার তাগিদ সুরু হ'লো পাখিদের মধ্যে, পোটলা-পুটলি বেঁধে বনভোজনের দলও ধীরে আস্তে বাড়ির দিকে পা বাড়াবার কথা ভাবলো।

এই সময় দলছুট হ'য়ে পাহাড়ি ফুলের সন্ধানে একটু দূরে চ'লে এসেছিলো নন্দিনী। আর খানিকটা উঠে নেমে টিলাটার ধারে গেলেই ঈশ্বরের বাগানটা তার হাতের নাগালে এসে যায়। সে ছুটছিলো, ছুটতে ছুটতেই দাঁড়িয়ে গেলো সম্মোহনের মতো। অনিতদূরেই একটি

লতাপাতায় ঘেরা কুটিরের মধ্যে সেই ভীমপলশ্রীর সহস্র ভ্রমর সমুদ্রেব ঢেউয়ের গভীরতা নিয়ে গুমরে-গুমরে উঠছিলো। সুরের হাওয়া পাকিয়ে-পাকিয়ে আগুনের শিখার মতো ঢিমে লয়ে নাচতে নাচতে উর্দ্ধাকাশে ভগবানের সন্ধানে যেতে যেতে ছড়িয়ে পড়ছিলো সারা গাড়ো পাহাড়ের আনাচে কানাচে উপত্যকায়?

সেই টানে নন্দিনী অচেতনের মতো পায়ে-পায়ে কুটিরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। খোলা দরজা দিয়ে দেখতে পেলো তুষারের মতো শুভ্র নরম দাড়ি চুলে আচ্ছন্ন এক যোগী মুদ্রিত চোখে এই ধ্যানে মগ্ন।

দোরের বাইরে হাঁটু ভেঙে ব'সে পড়লো সে। মেয়ে হ'য়ে জন্মেছে ব'লে এতোকাল যত কষ্ট তাকে নিপীড়িত করেছে, তা শুধু জন্মগ্রহণ করার সুখেই সার্থকতায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো। নিজেকে তার শুচিস্নাত মনে হ'লো, সারা অন্তর জুড়ে এক শান্ত হাহাকার উত্তাল হ'য়ে উঠলো।

একটু বাদেই তানপুরা রেখে চোখ খুললেন তিনি, নন্দিনী প্রণাম করলো। তিনি অবাক হ'য়ে বললেন, 'তুমি কে মা?'

কী আর পরিচয় আছে তার। তবু উত্তর প্রত্যুত্তরে নিজের নাম পিতার নাম বাড়ি কতোদূর সব বলতে হ'লো, আর সেই সূত্রেই জানা গেলো ইনিই সেই নিরুদ্দেশ আল মামুদ, এককালে তার পিতার সহপাঠী ছিলেন। রোমাঞ্চিত হ'য়ে বাড়ি ফিরে এলো নন্দিনী। কিন্তু বাড়ির কারোকে বললো না সেকথা। বাড়ির আবহাওয়া জানতো ব'লেই বললো না। বললে যে কখনোই এখানে তাঁরা আসতে অনুমতি দেবেন না সে বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ ছিলো। তাই আবার যখন গেলো, লুকিয়েই গেলো। তারপর আবার! আবার! আবার!

এইবার ভক্তির বন্ধনে ধরা পড়লেন মামুদ সাহেব আর নন্দিনী বাঁধা পড়লো তাঁর স্নেহের ভোরে।

বাড়িতে নানা ধরণের ফাঁকি দিয়ে বেরুতে হ'তো নন্দিনীকে। রোজ সম্ভব না হ'লেও সপ্তাহে দু'তিন দিন তো নিশ্চয়ই। কোনোদিন বলতো অমুক সিস্টারের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি, কোনোদিন বলতো অমুক বন্ধু একবার যেতে বলেছে, কোনদিন বা সুযোগ মতো না ব'লে কয়েই বেরিয়ে পড়তো। কিন্তু ধরা পড়লো শীগ্‌রিই। তার ওভারসীয়ার বড়দা সুবোধই ধরলো। কাজ সেরে সাইকেল নিয়ে টুপি মাথায় বাড়ি ফিরছিলো সে, হঠাৎ বিকেলের পড়ন্ত আলোয় বোনকে দ্রুতপায়ে একটা পাথর ডিঙোতে দেখে তাড়াতাড়ি নেমে পড়লো সেখানে, তাকিয়ে রইলো, তারপর অনুসরণ ক'রে ক'রে ওস্তাদজির ডেরার পিছনে এসে দাঁড়ালো, আর তাবপর নিজেও ব্যাকুল বোধ করতে লাগলো সুরের জাদুতে। গান সে-ও খুব ভালোবাসতো। বালক বয়সে মাঠঘাট ভ'রে দিয়ে সে-ও গান করতে করতে বাড়ি ফিরতো। তারপর কবে থেমে গেছে সেই ঢেউ। পারিবারিক মতামত গানের পক্ষে অনুকূল ছিলো না। গান করলে চরিত্র নষ্ট হয়, এই ছিলো তাদের বদ্ধমূল ধারণা। সে সব প্রায় ইতিহাস। তবু কবরের তলা থেকে উঠে এলো পুরাতন প্রেম। যখন দু'ভাইবোনে চোখা চোখি হ'লো তখন দু'জনেই মুগ্ধ স্রোতা।

নিষেধ শাসন অভিযোগ অভিমান এসবের আর কোনো প্রশ্ন ছিলো না তখন, কেন না সে-ও তখন ওস্তাদজির পায়ের তলায় ব'সে জগতের সব শান্তিকে একত্রিত হ'তে দেখলো।

সুবোধের সঙ্গে পরিচয় হবার পরেই, জোর বাড়লো নন্দিনীর। দু'ভাইবোন মিলে একদিন তাঁকে ধ'রে নিয়ে এলো বাড়িতে। বাবা আর ওস্তাদজি পরস্পরের দিকে তাকিয়েই ফিরে গেলেন নিজেদের শৈশবে, খাওয়া-দাওয়া হাসি-গল্পে ফকির এবং সংসারী দু'জনেই অন্যমানুষেই পরিণত হলেন কয়েক ঘণ্টার জন্যে।

গান ভজনা করার সেই হ'লো প্রথম সূত্রপাত। ওস্তাদজি বললেন, "সন্তোষ, লেকড়ি তোমার একদম কোকিল।"

সন্তোষ কন্যার প্রশংসায় গোঁফের ফাঁকে হাসি লুকোলেন।

'এই এক মাসে শুধু শুনে শুনে ও যা শিখে নিয়েছে, আমার অন্য ছাত্ররা কোনোদিন ছ'মাসেও তা শিখতে পারতো না। আমাকে অনেক তালিম দিতে হ'তো।

'এক মাস!' বাবা আকাশ থেকে পড়লেন।

হ্যাঁ, একমাস হ'লো বৈকি। তাই না মাতাজী?'

মাতাজী চুপ। ওস্তাদজিকে সে কী ক'রে বোঝাবে তার গোপন অভিসারের কথা! সুবোধই মাঝখানে প'ড়ে নানা ভাবে ঘুরিয়ে দিলো কথাটা।

ঘুরিয়ে দিলেও আর চাপা রইলো না। নন্দিনী নিজেই আর চেপে রাখলো না। জীবনে এই প্রথম সে একটা কাজ লুকিয়ে ক'রে মনে মনে অপরাধী বোধ করেছিলো। বলতে পেরে বাঁচলো। আগুন যতোই ছিট্‌কোক না কেন, সেই তাপ সে সহ্য করতে পারবে কিন্তু এই গোপন শীতলতা অসহ্য।

বলাই বাহুল্য যুদ্ধ আবার প্রচণ্ড হ'লো। একটা ভদ্রলোকের মেয়ে মোছলমান ওস্তাদের কাছে বাঈজিদের মতো ব'সে গান শিখবে এর চেয়ে আত্মশ্লাঘার বিষয় আর কী থাকতে পারে? কেন, সে কি মুজ্‌রা খাটতে যাবে? নাচনেওয়ালী হবে? ঠাকুমা এরচেয়ে অনেক তীব্র ভাষায় এইসব বলতে লাগলেন, মা-ও যথেষ্ট মারমুখী হ'য়ে বিরোধিতা করতে লাগলেন।

কিন্তু দমানো গেলো না মেয়েকে। ছুটির তিনটা মাস তার যে কেমন ক'রে কখন উড়ে উড়ে চ'লে গেলো কিছুই টের পেলো না। নিরুপায় হ'য়ে একদিন সন্তোষবাবু বললেন, 'তুই কলকাতা যাবি কবে?' বললেন অবশ্য স্ত্রীর পরামর্শেই, নইলে গান নিয়ে তাঁর তেমন কোনো আপত্তি ছিলো না। অল্প বয়েসে এই দুই ছেলেমেয়ের মতো তাঁরও যথেষ্ট সঙ্গীত প্রিয়তা ছিলো।

মনে আছে এক রাত্রে কোথায় কোন জলসাতে গিয়ে আমি সকালে ফিরে এসে দুর্দান্ত মার খেয়েছিলাম বাবার কাছে। এই আল্ল মামুদই নিয়ে গিয়েছিলো তাঁকে। সেই শেষ।

নন্দিনীর বি. এ. পরীক্ষা দিয়ে আসার পরে আরো একটা ছোট্ট ঢেউ উঠেছিলো এম. এ. পড়া নিয়ে। বি. এ. পর্যন্ত সে মেয়েদের সঙ্গেই পড়েছে, কিন্তু এম. এ. তে ছেলেদের সঙ্গে পড়তে হবে জেনে মা ঠাকুমা আপত্তি তুলেছিলেন। নন্দিনী যৎসামান্য তর্কাতর্কি করেই আর কথা বাড়ায়নি, ভেবেছিলো, যাক ক'দিন তারপর দেখা যাবে। কিন্তু সেই ক'দিন আর তার ফুরোলো না। গানের নেশায় মধুর লোভে মৌমাছির মতো আটকে গিয়ে ভুলে গেলো সেকথা।

সন্তোষবাবুর স্ত্রী বললেন, 'এর চেয়ে তো ওর কলকাতা গিয়ে ছেলেদের সঙ্গে পড়াও ভালো ছিলো। তবু তাতে সম্মান বজায় থাকতো, কেউ অন্তত বেশ্যা বাঈজি বলতো না। বিয়ে হোক না হোক একটা চাকরি ক'রে খেতে পারতো। কিন্তু ভদ্রলোকের বাড়িতে এসব কী? তুমি তো নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছো।'

সন্তোষবাবু বললেন, 'সত্যি তো অন্যায় কিছু করছে না? কী বলবো বলো?'

'অন্যায় করছে না? এটা অন্যায় নয়?'

'ছাখো, বিবাদ ক'রে পড়াশুনো করলো ব'লে আজ কতো ভালো ভালো ঘরে যাঁরা আমাদের চেয়ে অনেক উপরে তাদের সঙ্গে বিয়ে দেবার কথা ভাবা যাচ্ছে। চাই কি একজন বিলেত ফেরৎ ছেলের সঙ্গে হয়তো বিয়ে হ'য়ে যাবে। তারা তো এই রকমই চায়।'

'বেশ তো তা হ'লে আবার কলকাতাই চ'লে যাক, পড়ুক গিয়ে, আমরা এদিকে সম্বন্ধ দেখি। তা ব'লে মেয়েমানুষ হ'য়ে গান নিয়ে প'ড়ে থাকবে নাকি? তুমি কালই ওকে কলকাতা গিয়ে পড়ার অনুমতি দিয়ে দাও।'

সেই পরামর্শ অনুযায়ীই সন্তোষবাবুর এই প্রশ্ন। কিন্তু প্রশ্ন শুনে যেন ঘোর ভেঙে জেগে উঠলো নন্দিনী, 'কলকাতা? কলকাতা কেন?'

'এম. এ. তে ভর্তি হবি তো?'

'এম. এ. তে?'

'বি. এ.-টা যখন পাশ করলি, এম. এ. টাও করে ফ্যাল।'

তড়বড়িয়ে ঠাকুমা এসে গেলেন আসরে। 'মেয়ে নিয়ে ঢের হয়েছে সন্তু, আর সোহাগ ক'রে কলকাতা পাঠাতে হবে না। বিয়ে না দিয়ে মেয়েকে কি তোরা ঝিঙ্গা বিচি বানাবি? বুড়ো মেয়ের জন্য শেষে আর জুটবে নাকি কেউ?'

সন্তোষবাবু থেমে গেলেন।

বড়ো ছেলে সুবোধ বললো, 'গান শিখছে শিখুক না, গান শেখাটা তো আর কিছু না? সময় কাটানো। তোমরা বিয়ের চেষ্টা করো না।'

নন্দিনী এখানেও প্রতিবাদে মুখর হ'য়ে ব'লে উঠলো, 'না না এখন বিয়ে না।'

মা ঝাঁঝিয়ে বললেন, 'এখন না তো কখন?'

'এখন ওসব নয়।'

'এখন তবে কী?'

'দেখছোই তো কী।'

'না দেখছি না।'

'কিন্তু মা — '

'এবার আর কোনো কিন্তু নয়।'

'কিন্তু বিয়েটা তো আমার? আমি না করলে কী ক'রে দেবে?'

'কী বললি? অসভ্য মেয়ে। তোমার অনেক আব্দার অত্যাচার সহ্য করেছি, আর নয়।'

'আব্দার হয়তো কিছু করেছি কিন্তু অত্যাচার কখন করলাম বলো তো?' নন্দিনী হেসে মায়ের রাগ জল ক'রে দেবার চেষ্টায় গলা জড়িয়ে ধরেছিলো, মা ঠেলে দিলেন।

'আর ন্যাকামো করতে হবে না, এসব আমার ঢের জানা আছে। হাতে পায়ে বেঁধে হ'লেও গলার কাঁটা এবার তুলে ফেলবো আমি।'

'গলার কাঁটা। কে? আমি?'

'তুই ছাড়া আর কে? কে এ বাড়িতে এত বেহেড যার লজ্জা নেই সরম নেই মা বাপ ব'লে মান্য মাননা নেই।'

শক্ত হ'য়ে নন্দিনী বললো, 'যদি কাঁটাই ভাবো অবশ্যই উপড়ে দেবে, আমিই বা ভার হ'য়ে থাকবো কেন? তবে বিয়ে আমি করবো না, এটা ঠিক জেনো।'

'না তা করবে কেন, একটা মোছলমানের সঙ্গে খাওয়া মাখা ক'রে চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করবে। এ সব আমি ঘুচিয়ে দিচ্ছি তোমার।'

নন্দিনীর ঠিক আসল জায়গায় ঘা দিলেন মা। তার আরাধ্যকে তিনি অসম্মান করলেন। বলাই বাহুল্য এই উক্তি তার মর্মমূলে গিয়ে বিদ্ধ হ'লো। অনেকক্ষণ তীব্র চোখে তাকিয়ে থেকে সে আগুন হ'য়ে সেখান থেকে চলে গেলো।

সন্তোষবাবু তিরস্কার করলেন স্ত্রীকে, 'নিজের মেয়ে নিজে চেনো না। তোমার কি ধারণা এই ক'রে তুমি ওকে ফেরাবে? সুবোধ তো বললোই, যতোক্ষণ বিয়ে না হয় শিখছে শিখুক গান। ক্ষতি তো নেই, পয়সা তো লাগছে না। তা নয়, যাকে ও এতো ভক্তি করে, এতো ভালোবাসে তার সম্বন্ধে জাত-ফাত তুলে যা তা ব'লে আরো গোলমাল পাকালো।'

মেজদি বললো, 'আর ও-কি এখন একটা যেমন তেমন মেয়ে নাকি? ক'টা পুরুষ বি. এ. পাশ করে? তাকে এ সব বলো কেমন ক'রে?'

ঠাকুমার পরামর্শেই মা সব করেন, কিন্তু ঠাকুমাও বললেন, 'হ্যাঁ বৌমা, এখন আর অতো বকাবকি না করাই ভালো। কয়েকদিন চুপচাপ থাকো, তলায়-তলায় সম্বন্ধ দেখো, দেখবে সব ঠিক হ'য়ে যাবে।'

তাই হ'লো। এরপর আর কেউ কিছু বললো না নন্দিনীকে। যেমন সে ওস্তাদের কাছে গিয়ে গান শিখছিলো, তেমনিই শিখতে লাগলো। পুরো একটি বছর এই সাধনায় লেগে রইলো সে। একেবারে ধ্যানের মতো। গুরুকে সে ঈশ্বরের আসনে বসিয়েছিলো, গুরুরও কোনো

তুলনা ছিলো না। আলমামুদ একান্ত ভাবেই সন্ন্যাসী ছিলেন। এমন ভক্তির যোগ্য মানুষও কি সহজে মেলে?

কিন্তু বছর ঘুরতেই পাওয়া গেলো মনোমত পাত্র। বি. এ. পাস মেয়ের সম্বন্ধ করা কি সোজা কথা? তাদের সমকক্ষ ঘরে তো একথা শুনলে কানে আঙুল দিয়ে দৌড়োয়। আর বড়ো ঘর কোথায় ঐ জঙ্গলে? কিন্তু ঐ জঙ্গলেই যে এমন ফুল ফুটেছিলো কে জানতো?

সম্বন্ধটা সুবোধই আনলো। একেবারে পাশাপাশি শহরে মাত্র দু'তিন মাইলের মধ্যেই তাদেরবাড়ি। বাড়ি বললে কম বলা হয়, বলা যায় প্রাসাদ। তেইশ বিঘা জমি নিয়ে তার চৌহাদ্দি। মস্ত ধনী, মস্ত ব্যবসা, তিনটি চায়ের বাগানের মালিক, একটি পেট্রোল পাম্প, মালিকটির নাম নবীন চন্দ্র মিত্র মজুমদার, এক ডাকে সবাই চেনে, সবাই জানে এরকম একজন কর্মিষ্ঠ লোক খুব কম দেখা যায়।

বাপ মারা গেছে অনেক দিন আগে, এই বিত্ত তার সব নিজে হাতে গড়া। অথচ বয়েস মাত্র চল্লিশ এবং এখনো অবিবাহিত। পরিবার ছোট, মা আছেন, ভাই আছে, বোনের বিয়ে হ'য়ে গেছে। ঝাড়া-ঝাপটা হ'য়ে এখন বিয়ে করবার মন হয়েছে। সুন্দরী মেয়ে চায়।

এই তল্লাটে এই নবীনমিত্রের নাম কে না জানে। কে না জানে লক্ষ্মী তার ঘরে অচলা। চিকিৎসা করতে গিয়ে তেইশ বিঘা জমির উপর ঐ বিশাল বাড়িটি কতোবার দূর থেকে দেখেছেন সন্তোষবাবু। বলা যায় একটা গল্প কথার মানুষ। তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে। এমন ভাগ্য আশা করা যায়? সারা বাড়ি নেচে উঠলো।

কিন্তু সংশয়ও কম নয়। এমন একটা লোকের সঙ্গে প্রস্তাবটা কী ভাবে পাঠানো যায়, আর পাঠানো সঙ্গত কিনা তাই বা কে জানে।

সুবোধ বললো, 'ভদ্রলোক বাড়ির একস্‌টেনসন্ করলেন, অন্দর আর সদর সম্পূর্ণ আলাদা ক'রে দিলেন, আমার এক বন্ধু কাজ করছিলো সেখানে, সে-ই বলছিলো চেষ্টা ক'রে দেখতে পারো আমি খবরা-খবর এনে দিতে পারি। তোমার বোনের নাম ওরা শুনেছে।'

অবাক হ'য়ে সন্তোষবাবু বললেন, 'নাম শুনেছে মানে ?'

'কুন্দ যখন ম্যাট্রিক পাস করলো সুবাই তো তখন নাম জেনে গিয়েছিলো, তারপর আই. এ. পাশ করার পরে ছবি বেরুলো খবরের কাগজে — '

'ও। তা হ'লে ছাখো না।'

'আমি যা দেখবার দেখে এসেছি, যা বলবার ব'লে এসেছি, এখন অপেক্ষা।

অপেক্ষা অবশ্য বেশি করতে হ'লো না। কয়েক দিনের মধ্যেই বন্ধু এসে জানিয়ে গেলো, খবরের কাগজে ছবি দেখেছেন বলেই প্রস্তাব করা মাত্র মেয়ে দেখতে রাজি হয়েছেন। তবে টাকার খাঁই আছে খুব। অবশ্য দেখে যদি মেয়েকে চোখে লেগে যায় তা হ'লে কী হয় বলা যায় না। খেয়ালী মানুষ তো ?'

সুবোধ বললো, 'আর গুণ যোগ্যতার কথাটা ?'

বন্ধু বললো, 'কী গুণ ?'

'এই যে ছবি বেরুলো কাগজে, তারো পরে বি. এ. পাস করলো, আবার গান জানে — এ সব ভালো ক'রে বলা হয়েছে তো ?'

'না না ওসব তিনি কানে তুললেন না।'

সন্তোষবাবু বললেন, 'কে কানে তুললো না, কার সঙ্গে কথা-বার্তা হ'লো ?'

'পাত্রের সঙ্গেই।'

'কেন, কোনো গুরুজন নেই ?'

তা থাকলেই বা, তিনি নিজেই নিজের কর্তা। তাঁর উপরে কে কথা বলবে। খুব রাশভারি মানুষ তো ?'

এর পরে গুটি গুটি বড়ো ছেলে সুবোধ আর মেজ ছেলে প্রবোধ দিনক্ষণ ঠিক ক'রে গেলো একদিন। স্বয়ং নবীন মিত্রকে দেখে চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন ক'রে কথাবার্তা ব'লে এলো।

সবাই উৎসুক হ'য়ে পথের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করছিলো কী খবর নিয়ে আসে।

প্রবোধ বললো, 'বড্ড দাম্ভিক লোকটা। একজন মামাকে দেখলাম, চমৎকার ভদ্রলোক, তার সঙ্গে কেমন মনিবের মতো ব্যবহার করছিলো। আর টাকা পয়সা বিষয়ে ভীষণ টাইট। কেবল দর দাম করার মতো কথা বলছিলো।'

ছোটো ছেলে ভুরু কুঁচকে বললো, 'বাদ দাও, বাদ দাও, এখানে আর চেষ্টা কোরো না, কুন্দর মতো মেয়েকে বিয়ে করতে যে দর-দাম করে তার কোনো শিক্ষা-দীক্ষা আছে ব'লে আমি মনে করি না। নিজে কী পাস?'

সুবোধকে ঈষৎ চিন্তান্বিত দেখাচ্ছিলো, অনেক ভেবে বললো, 'লোকটির টাইপটা সত্যি একটু অন্যরকমের। তবে আমাদের মতো তো আর ছা পোষা লোক নয়, লক্ষ টাকার মালিক, আর এ অবস্থা ওর নিজের তৈরি, একটু তো ইয়ে হবেই।'

'তাই তো।' সন্তোষবাবু সায় দিলেন। মা ঠাকুমাও বললো, 'লক্ষপতির প্রতাপ থাকবে না তো কার থাকবে? এ হ'লো গিয়ে পুরুষ সিংহ। যদি কপালগুণে এই ঘরে তোদের বোন যেতে পারে বুঝবি বৃহস্পতি তুঙ্গে।'

'কতো চায়?' সন্তোষবাবু বড়ো ছেলের মুখের দিকে তাকালেন।

'নগদ তিনহাজার দিতেই হবে!'

চা-বাগানের ডাক্তারি ক'রে মন্দ জমাননি সন্তোষবাবু। ভেবেছিলেন, সুযোগ সুবিধে মতো একটু জায়গা কিনে একটি ছোটো বাড়ি করবেন। সেই জমা টাকাটার কথা চিন্তা ক'রে বললেন, 'অতো বড়ো ঘরে দিতে হ'লে একটু তো হাতের মুঠো খুলতেই হবে। তবে ব'লে ক'য়ে কিছু কমে যদি —'

'আমি তাই ভাবছিলাম —' সুবোধ বললো, 'এটা তো তৃতীয় ব্যক্তির কথা, নিজেরা গিয়ে যদি কিছু করা যায়।'

'তার মানে টাকা পয়সার কথা, ডিরেক্ট তোমাদের সঙ্গে হয় নি?'

'একটু তুলেছিলাম, উনি তোমার সঙ্গে বলতে চান।'

'মানে আমাকে যেতে হবে?'

'তুমি বাবা, ফাইন্যাল কথা আমাদের সঙ্গে আর কী বলবেন। জিজ্ঞেস করলেন, অভিভাবক কে? আমরা বললাম বাবা। তখন বললেন তাঁকেই পাঠিয়ে দেবেন।'

'তবে তো যেতেই হয়।'

কিছুটা ভালোমানুষ আর কিছুটা ভীতু সন্তোষবাবু জিব দিয়ে ঠোঁট চাটলেন, তারপর স্ত্রীর দিকে তাকালেন। ভরসা দিয়ে স্ত্রী বললেন, 'সে তো ঠিকই কথা, বাপ থাকতে ঐটুকু টুকু দাদাদের সঙ্গে কী কথা বলবে অতবড়ো একটা লক্ষপতি মানুষ?'

এই লক্ষপতি শব্দটা উচ্চারণেও সুখ হচ্ছিলো নন্দিনীর মার।

অতএব আবার সেই তৃতীয় ব্যক্তিটির সাহায্যে দিনক্ষণ স্থির ক'রে সন্তোষবাবুকেও যেতে হ'লো। একা নয়, সুবোধ সঙ্গে আছে অবশ্য।

ফটক দিয়ে বাড়ির ভিতরে ঢুকতে প্রায় পা কাঁপছিলো তাঁর। কোথা থেকে ব্যস্ত সমস্ত হ'য়ে ফিরে গাড়ি থেকে নামলেন নবীন মিত্র, পরিচয় জেনে নমস্কার বিনিময় ক'রে বললেন, 'বলুন কী কথা আছে।'

ঢোঁক গিলে সন্তোষবাবু বললেন, 'ঐ মেয়ে দেখার কথা মানে—'

'কবে বলুন—'

'আর ঐ টাকা কড়ি—'

'আমি তো শিশিরবাবুকে সব ব'লে দিয়েছি।'

'বলছিলাম যে, যদি নগদ টাকাটা কিছু কম করেন—'

'তিন হাজার।'

এবার সুবোধ বললো, 'একটু বিবেচনা করুন স্যর, ম্যাট্রিকে প্রথম বিভাগ, আই. এ.তে প্রথম দশজনের একজন আর—'

'ওসব শুনে আর কী হবে? আমার সময় বড়ো কম। বসুন, একটু জলযোগ করুন, জগন্নাথ,—' হাঁকতে হাঁকতে তিনি ভিতরে ঢুকে গেলেন।

পিতাপুত্র দু'জনেই চুপসে গেলো। সুবোধের দুঃখ হ'লো। তার এতো বিদুষী বোন আর লোকটা কিনা কোনো মূল্যই দিলো না। আর কী রকম তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি। অপমান লাগছিলো তার। ফিস ফিস ক'রে কী বলতে গিয়েছিলো বাবার কানে কানে, এরই মধ্যে খাবারের প্রস্থ এসে গেলো এবং সে প্রস্থ উল্লেখযোগ্য। সঙ্গে সেই মামা এলেন, ভাই এলো, আরো একজন এলেন, কিছুক্ষণ পরে পোষাক বদলে নবীনও এসে দাঁড়ালো। কিন্তু দাঁড়ালোই, বসলো না, তবে ভদ্রতারও ত্রুটি করলো না। বিদায় নিতে নিতে বললো, 'এক্ষুণি গৌহাটি যেতে হচ্ছে জরুরী কাজে কিছু মনে করবেন না।'

সত্যিই কিছু মনে করলেন না সন্তোষবাবু। বাড়ি গাড়ি, লোক লস্কর, খাদ্য সম্ভারের প্রাচুর্য সবটা মিলে একেবারে হকচকিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। আর নবীন মিত্রর ব্যস্ততাটাও তাকে কম অভিভূত করলো না। তিনি মনে মনে যে কোনো মূল্যে এই পাত্রের হাতে মেয়ে দিতে বদ্ধ-পরিকর হ'লেন।

১২

তবু কিন্তু সুবোধ বলেছিলো। 'এ সম্বন্ধ থাক বাবা, বড়ো ইয়ে ভদ্রলোকটি। একটু অভদ্রই।'

সন্তোষবাবু বললেন, 'অভদ্র কোথায় দেখলি তুই? আমি সব খোঁজ নিয়েছি, চরিত্র একেবার নিষ্কলুষ, বড়ো লোকদের যে-সব দোষ হাতে ধরা তার একটাও এর চরিত্রে নেই। কোনো নেশা করে না, কাউকে ঠকায় না, মিথ্যে কথা বলে না, কথা দিয়ে কথা রাখে — '

'তা হ'লেও সমানে সমানে থাকাই ভালো।'

'না না, ওসব নিয়ে ভাবিস না। শুধু যে চায়ের বাগান আর পেট্রল পাম্প তাই তো নয়, জঙ্গলের ব্যবসাতেও লাল, আবার শুনছি কোথায় একটা সিনেমা হল বানাচ্ছে।'

'এ হচ্ছে বামন হ'য়ে চাঁদে হাত দেবার মতো, দাদা ঠিকই বলেছে সমানে সমানে থাকাই ভালো, নইলে কোনো না কোনো সময়ে গোলমাল ঠিক বাঁধবেই।' এটা মেজ ছেলে প্রবোধের কথা।

'কুন্দও শেষে আমাদের আর চিনবে না —।' এটা ছোট ছেলে বিজনের উক্তি।

মা বললেন, 'না না ওসব কোনো কথাই নয়, যদি এ-বিয়ে হয় তবে জানবি তোদের বহু জন্মের সুকৃতির ফলেই সম্ভব হয়েছে। তবে ঐ বয়েসটাই যা একটু —'

ঠাকুমা বললেন, 'পুরুষের আবাব বয়েস কী? মেয়েই কি তোমাদের ছোটো নাকি?' কর গুণলেন, 'এই তো এই বৈশাখে পুরো বাইশ বছরের হ'য়ে যাবে।'

'যাক গে বাবা, আমি এর মধ্যে নেই। দু'খানা গাড়ি আছে, বোনের গাড়ি চ'ড়ে বেড়ানো যাবে খুব এই আমার লাভ।' ব'লে আড্ডা দিতে চ'লে গেলো বিজন কিন্তু গুরুজনেরা মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি হ'য়ে বসে রইলেন।

এর মধ্যেই খুব অপ্রত্যাশিত ভাবে মেয়ে দেখতে আসার প্রস্তাব পাঠালেন নবীন মিত্র। বন্ধু বললেন, 'মনে হচ্ছে মিত্র মশায়ের মন পড়েছে এখানে তা নৈলে আপনারা না ডাকা পর্যন্ত নিজে থেকে আসবার কথা বলতেন না। আর নিজেই যখন আসতে চাইছেন তখন দেনা-পাওনাটাও বোধহয় ঢিল দেবেন।'

এ-কথার পরে যার মনে যতোটুকুই দ্বিধা থাক না কেন এক নিমেষে তা নির্মল হ'য়ে গেলো। দিশাহারা আনন্দে সন্তোষবাবু বললেন, 'আরে অত বড়ো একজন লোকের সঙ্গে এর আগে আমরা কি কখনো মেলামেশা করেছি? না কি দেখেছি কখনো? তাদের ধরণ-ধারণ তো আমাদের চেয়ে আলাদা হবেই।'

সুবোধও কৃতার্থের মতো মাথা নেড়ে বললো, 'তা ঠিক। তা ঠিক।'

এরপরে বাড়ির লোকেরা একেবারে উদভ্রান্ত হ'য়ে পড়লো। কী দিয়ে যে কী করবে ভেবে পাচ্ছিলো না কেউ।

১৩

ইদানিং মামুদসাহেব মাঝে মাঝে বাড়ি এসেই গানে তালিম দিতেন নন্দিনীকে। হঠাৎ হঠাৎ সকালের দিকে এসে হাজির হতেন দরজায়, 'আমার মাতাজী কোথায়?' ব'লে হাঁক দিতেন। বলতেন, 'আবার আমি সংসারে জড়িয়ে পড়েছি সন্তোষ, তোমার লেড়কিকে না দেখলে আমার দিন কাটে না, তোমার লেড়কির পাখির মতো গলা না শুনলে কানই দুরস্ত থাকে না।'

একটি তানপুরো তিনিই উপহার দিয়েছিলেন, ব'সে যেতেন সেটি নিয়ে, সরু মোটা তারের সঙ্গে মিলে যেতো সরু মোটা গলার গানের স্রোত, দূরে অদূরে প্রতিধ্বনিত হ'তো সেই সুর। ঝাঁকে ঝাঁকে বসন্তের পাখির মতো তানের কাজ হাওয়ায় তরঙ্গ তুলতো। মিড় গমক মূর্ছনা সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো গড়িয়ে গড়িয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেতো সব কোমল পর্দা।

সেদিনও তেমনিই তদ্গত হ'য়ে গুরুর সঙ্গে ব'সে গান করছিলো নন্দিনী, মা দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে শব্দ করলেন একবার, দু'বার, তিনবার।

সুর ছিঁড়ে গেলো। নন্দিনী ফিরে তাকালো অন্দরের দিকে। মা ইসারা করলেন।

'কী?' দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো দন্দিনী।

মা বললেন, 'কথা আছে।'

'কী কথা?'

'গান রাখ, তারপর বলবো।'

'পরে বললে হয় না?'

'পরে হ'লে আর এখন ডাকবো কেন ?' রাগ ভাব করলেন তিনি।

অগত্যা তানপুরার তার বন্ধ হ'লো, গান বন্ধ হ'লো, ওস্তাদজি উঠলেন। তাঁকে রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে নন্দিনী মার শোবার ঘরে এসে বললো 'বলো, কী কথা যা তোমার এক্ষুণি না বললে চলছিলো না।'

মা ঢোঁক গিললেন, 'শোন, নবীন মিত্রের নাম শুনেছিস ?'

'কে সে ?'

'মস্ত বড়োলোক। যা কে বলে লক্ষপতি।'

'কী হয়েছে তার ?'

'তিনটে চায়ের বাগানের মালিক, একটা পেট্রল পাম্পের মালিক, নিজের রাজ প্রাসাদের মতো বাড়ি, দুটো গাড়ি আছে, আবার সিনেমা হাউস খুলেছে — '

'তা আমার কী করতে হবে সেজন্য ?'

'সে তোকে বিয়ে করতে চায়।' মা সাহসীর ভঙ্গিতে মাথা উঁচু ক'রে থাকলেন।

'আমাকে !'

'হ্যাঁ।'

'কেন ?'

'তোর ভাগ্য আবার কেন ?'

'আমার ভাগ্য ?'

'আজ অথবা কাল বিকেলে দেখতে আসবে।'

'আজ অথবা কাল ?'

'কতো বড়ো ব্যবসায়ী লোক, কতো ব্যস্ত। বলেছে যদি আজ আসে চারটের মধ্যে আসবে নয়তো কাল সকালে। কিন্তু আমাদের তো প্রস্তুত থাকতে হবে ? তাই ডাকলাম। যা তাড়াতাড়ি চান-টান ক'রে খেয়ে, নে, একটু ঘুমিয়ে উঠলে মুখটা ফোলা ফোলা থাকবে, ভালো দেখাবে।'

বুকটা ধ্বক ক'রে উঠলো। আবার এক লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত

হ'তে হবে। বাল্যকাল থেকে সে মা-বাবার অবাধ্য সন্তান। সে লিখতে চেয়েছে, পড়তে চেয়েছে, এখন আবার গান শিখছে, শুধু শিখছেই না, তার অন্তরে প্রবেশ পথ খুঁজে পেয়েছে, অপরাধের কি অন্ত আছে তার? এখন বিয়ে। এখন ঘুমিয়ে নিয়ে মুখ-টুখ ফুলিয়ে টাটকা হ'য়ে বড়লোক পাত্র ধরবার জাল পাততে হবে।

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থাকলো। অন্যান্য বারের মতো প্রথম প্রতিক্রিয়া হিশেবে তীব্র প্রতিবাদে ঝেঁকে উঠলো না। কেমন একটা চাপা বেদনার অনুভূতিতে হঠাৎ কান্না এসে গেলো।

মেয়েকে এ-রকম নীরবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মা উৎসাহিত হলেন। তিনি মনে মনে অনেক কিছুর জন্যেই প্রস্তুত হ'য়ে গান থামিয়ে ডেকে এনেছিলেন, এবার খুশি হয়ে বললেন, 'আমরা কি এ-রকম কখনো ভাবতে পেরেছি? এখন দেখ পছন্দ হয় কিনা, কপালে সোনার টিপ পড়তে পারিস কি না।'

আস্তে আস্তে হেঁটে নন্দিনী আলনা থেকে শাড়ি জামা তোয়ালে নিয়ে উঠোনের দরমার বেড়া ঘেরা ইঁট পাতা স্নানের ঘরে চ'লে গেলো। এই মুহূর্তে এর চেয়ে নির্জন জায়গা আর কোথায় আছে এ বাড়িতে?

খেতে ব'সে ঠাকুমাও বললেন, 'রাজপুত্র যে এবার ঘোড়া ছুটিয়ে ঘুঁটে কুড়ুনিকে নিতে আসছে দিদি।'

নন্দিনী চুপ।

খেয়ে উঠে পান চিবুতে চিবুতে সন্তোষবাবুও হাসি মুখে বললেন, 'আগেই আশা করছি না কিছু, তবে সত্যি যদি পছন্দ করে তা হ'লে বুঝবো তুমি কপাল করেই এসেছ।'

মেজদা প্রবোধ বললো, 'পছন্দ করবে না মানে, আমার বোনের মতো সুন্দরী মেয়ে সারা আসাম খুঁজে বেড়ালেও সে পাবে না।'

বিজন বললো, 'দেখিস বাপু, আবার গরীব ভাই ব'লে যেন ভুলে-টুলে যাস না, গাড়িটা চড়তে দিস মাঝে মাঝে।'

সবাই খুশি, সবাই আনন্দিত। বাড়ির আবহাওয়া একেবারে অন্যরকম। যেন সুখের বান ডেকেছে। তারি মধ্যে সুবোধ এসে সাইকেল রেখে, মাথার সোলার টুপি খুলে সংবাদ পরিবেশন করলো, 'নবীন মিত্র আজ আসতে পারবেন না। শহরের বাইরে যেতে হচ্ছে। ফিরে এসে তারিখ জানাবেন কবে আসবেন।'

রাত্রে বিছানায় শুয়ে সেদিন সত্যি কাঁদলো নন্দিনী। এ-বাড়িতে কেন সে মেয়ে হ'য়ে জন্মেছে এ-কথা ভেবে দুঃখ তাকে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে গেলো। মেয়েদের কোনো দাম নেই এঁদের কাছে। মেয়েকে এঁরা শাস্ত্রসম্মতভাবে গবাদি পশুর অন্তর্গত কোনো প্রাণী হিসেবেই গণ্য করে, মানুষ ব'লে নয়। মেয়েদের কোনো স্বতন্ত্র ইচ্ছে আনন্দ আগ্রহ ব্যক্তিত্ব সবই অপাংক্তেয়, তাবা পুরুষের ইচ্ছাব পুতুল, সমাজের ক্রীতদাসী। মনে পড়লো বড়দা যখন ম্যাট্রিক পাস ক'রে আর কিছুতেই পড়াশুনো করতে চাইলো না, মা বাবা ঠাকুমা প্রত্যেকের কী রাগ। বাড়ির বড়ো ছেলে, তাকে দিয়ে তাদেব কতো আশা, কতো আকাঙ্ক্ষা, ছেলে বিদ্বান হবে, দশজনের একজন হবে, মস্তবড়ো চাকরি করবে, চাই কি একটা কলেজের প্রফেসর হতেই বা বাধা কী? কলেজের প্রফেসরদের প্রতি সন্তোষবাবুর ভারি ভক্তি।

কিন্তু বড়দা পড়াশুনোয় মোটেও ভালো ছিলো না। বারে বারে ফেল করেছে। মেজদাও তাই, ছোড়দাও তাই। মেজদা অতি কষ্টে টেনেটুনে আই. এ. পরীক্ষা পর্যন্ত গিয়েছিলো তারপর পরীক্ষা না দিয়ে পড়া ছেড়ে দাদার সঙ্গে ঢুকে গেল কনট্রাকটরীর কাজে। ছোড়দা অবশ্য কায়োক্লেশে বি. এ.-টা পাস করেছে তা-ও অনার্স নিয়ে নয়।

তিন তিনটি ছেলের একটিও যে লেখাপড়ায় তেমন ভালো হ'লো না এ-নিয়ে খেদের অন্ত নেই এ-বাড়িতে। ছেলেদের পিছনে কী পণ্ডশ্রমই না করেছেন ওঁরা। মাষ্টার রেখে দিয়েছেন, পরীক্ষার সময় আপ্রাণ যত্নে কতো ঘি, কতো দুধ, কতো মাছ মাংস ডিমের শ্রাদ্ধই

না হয়েছে। সকলে পা টিপে টিপে হেঁটেছেন, গলা চেপে কথা বলেছেন, পাছে বাইরের শব্দে মনোযোগ ছিঁড়ে যায়। পরীক্ষা যে!

আর তার বেলা? শুধু পড়তে চাওয়ার জন্যেই কতো শাস্তি, কতো ঝগড়া, কতো বাদ প্রতিবাদ। না, তার জন্য কোনোদিন মাষ্টার রাখার প্রশ্ন ওঠেনি, আলাদা পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা হয়নি, আলাদা ঘর তো স্বপ্ন। এমন কি পরীক্ষার মধ্যেও কেউ এক ফোঁটা গোলমাল থামিয়ে নিবিষ্ট হ'তে দেয়নি তাকে। সে যে পড়ছে সে জন্যই চোর হ'য়ে থেকেছে সকলের কাছে। মনে আছে ম্যাট্রিক পরীক্ষার সময়ে অনেক রাত অব্দি লণ্ঠন জ্বালিয়ে পড়তো ব'লে কেরোসিনের অপচয় নিয়ে কত বিরক্ত হয়েছেন মা ঠাকুমা। সরবে বলেছেন, 'যা দেখছি কন্যার আলোর খরচেই বিয়ের আদ্ধেক খরচ চ'লে গেলো।' ইশকুলের মাইনে তিনবছর লেগেছিলো, তারপর তো ফ্রী। তা নিয়েও বা কতো রাগারাগি।

ভালোবাসা আবদার স্নেহ সবই ছিলো অবশ্য কিন্তু সবার উপরে উঁচিয়ে ছিলো এই বোধ যে সে মেয়ে। শুধু তাদের পরিবার বলেই নয়, সমাজ ব্যবস্থাই এ-রকম। ভগবানের অবিচারে একটা মেয়ে যদি হয়েই যায় কারো, কী আর করা, আপন সন্তান ফেলে তো দেয়া যায় না? লালন-পালন তো করতেই হবে? তা ব'লে ছেলেদের মতো ক'রে মানুষ করবার কথা ওঠে নাকি? মানুষ ক'রে কী হবে, রোজগার ক'রে এনে দেবে বাপ-মাকে? বুড়ো বয়সে বসিয়ে খাওয়াবে?

সন্তান স্নেহও স্বার্থহীন নয়। সেই বিনিময়। তোমাকে আমি এখন করলাম আমাকে তুমি পরে করবে। মেয়েরা তো পরের ঘরে চ'লে যাবে, এক গুচ্ছ খরচ হবে আবার তার জন্য, তবে কেন তার পিছনে অত মনোযোগ? অত সেবা-যত্ন? কাজেই যতো কম দিন খাইয়ে-পরিয়ে তাড়াতাড়ি বিবাহ নামক রজ্জুর বন্ধনে ঝুলিয়ে দেয়া যায় ততোই লাভ। দায়ীত্বও চুকলো পয়সাও বাঁচলো। সুতরাং

তাদের পক্ষে বিয়েটাই মোক্ষ। বিয়েটাই গতি। শিক্ষা-দীক্ষার তখনি মূল্য যদি বিয়ের বাজারে দর বাড়ে।

সে যে শেষ পর্যন্ত লেখাপড়ায় কৃতী হ'লো তা নিয়ে অবশ্য পরিবারের বেশ গৌরব আছে, আনন্দও আছে কিন্তু তাই ব'লে তা বিয়ে ছাপিয়ে নয়। সে যে কেবলমাত্র একজন মেয়েই নয়, মানুষও এই সংজ্ঞা নিয়ে নয়।

আর তারপর তার সর্বশ্রেষ্ঠ পাপ অথবা অপরাধ তার গান। সবাই কী তিক্ত বিরক্ত। ওস্তাদজি কতোবার বলেছেন, এ বিষয়ে তার প্রতিভা অনন্য, ডেকে বলেছেন সবাইকে, বাবা ছাড়া আর কে কান দিয়েছে সে কথায়। তাদের কাছে প্রতিভা শব্দের জন্ম মেয়েদের জন্য নয়। ওস্তাদজি কোনো কোনো দিন গান শেখাতে শেখাতে আনন্দে করতালি দিয়ে ব'লে উঠেছেন এমন গলা লাখে মেলে। মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করেছেন, 'জিতা রহ বেটি, জিতা রহ।' বাবাকে বলেছেন, আমার মাতাজীর মতো এমন নিষ্ঠা আমি শুধু একজনকেই দেখেছিলাম, আহা, তার গলায়ও সাতসুরের পাখি খেলা করতো।

ওস্তাদজি এ কথা বললে অমনি নন্দিনীর সেই রাজকন্যা পদ্মাবতীর কথা মনে হ'তো। তার সঙ্গে ওস্তাদজি তার তুলনা করায় সে রোমাঞ্চিত হ'তো।

না, তার গানকে নন্দিনী আর পাঁচজনের মতো একটা বাড়তি গুণ হিশেবে ভাবেনি, সখ হিশেবে দেখেনি, খেয়াল চরিতার্থ করেনি, গান তার সাধনা, গান তার ধর্ম। কিন্তু এদের কাছে এ-সবের কোনো অর্থ নেই। এই জন্যেই নেই, যেহেতু সে মেয়ে। যে মেয়ে তার আবার বিদ্যা কী? বুদ্ধি কী? প্রতিভা কী? আর নিষ্ঠা? নিষ্ঠার একমাত্র অর্থ তো তাদের পতিসেবা। মোক্ষম কথাই তাই। অর্থাৎ বিবাহ। এবং সেই বিবাহই এখন দরজায় সমাগত।

১৪

সেই রাতে এক বিন্দু ঘুমুতে পারলো না। ক্ষোভে দুঃখে অসম্মানে কেবলি ছটফট করলো। তাবপর সকালে উঠে বললো, 'যার সঙ্গে তোমরা আমার বিয়ে দিতে চাইছো, শুনলাম সে মস্ত ধনী, কিন্তু শিক্ষিত কিনা সেটা তো বললে না।'

'শিক্ষিত! শিক্ষিত মানে?' প্রশ্ন শুনে সবাই হতবাক। যার এতো বড়ো ব্যবসা, এতো টাকা, এতো গাড়ি-বাড়ি সে শিক্ষিত কি শিক্ষিত নয় এ-রকম যে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে এ-কথাই মগজে ঢুকলো না।

নন্দিনী বললো, 'এটা তো দেখবে, সে কী ভাবে থাকে, কী ভাবে চলে, কী রকম মতামত, পড়াশুনো করে কি না — '

'ও মা অতবড়ো মানুষটা আবার পড়বে কী?' মা একেবারে হতভম্ব।

মেজদা বললো, 'ঝুলে পড় ঝুলে পড। ক্রোড়পতির স্ত্রী হ'য়ে যখন গাড়ি হাঁকিয়ে বেড়াবি তখন এই সব আর মনে থাকবে না, নিজের নির্বুদ্ধিতার কথা ভেবে নিজেরই হাসি পাবে।'

বড়দা শান্ত মেজাজের ভালোমানুষ, তা ছাড়া এই পরিবারের মধ্যে কিছুটা স্বতন্ত্রও। বললেন, 'অত ভাবছিস কেন, শিক্ষিত না হ'লে বা বুদ্ধিমান না হ'লে কখনো এতো বড়ো ব্যবসা চালাতে পারে?'

'তাই তো,' সন্তোষবাবু এতক্ষণে খেই পেলেন, 'কতো বড়ো একটা গণ্যমান্য লোক।'

খবর পেয়ে বড়ো জামাইবাবু লিখলেন, 'এই রকম একটা আশাতীত ভাগ্য যে কুন্দর অদৃষ্টে অপেক্ষা করিয়াছিলো, তাহা কে জানিত। এখন ভালোয়-ভালোয় চারি হাত এক হইয়া গেলেই নিশ্চিন্ত। উহার তো খেয়ালের অন্ত নাই। আজ লেখাপড়া কাল গান-বাজনা, পর্শু যে আবার ছবি আঁকিতে বসিবে না তাহাই বা কে জানে — '

যাক, নন্দিনীর এতোদিনের এতো অন্যায়ের একটা স্খালন হচ্ছে বটে। লোকটি অনেক টাকা করেছে এবং সেই টাকাওয়ালা লোকটির সঙ্গে তাদের একটা কুটুম্বিতা হচ্ছে, মাত্র এইটুকুতেই এরা যে-রকম উত্তেজিত হ'য়ে উঠেছে তা দেখে নন্দিনী হাসবে না কাঁদবে বুঝে উঠতে পারে না। আর এ-কথাও বুঝে উঠতে পারে না এতো যার টাকা সে আবার অন্যের কাছে হাত পাতে কেন। আর যে লোক টাকা নিয়ে বিয়ে করে তাকে সে-ই বা বিয়ে করবে কেন? এর চেয়ে অপমান আর কী হ'তে পারে একজন মেয়ের পক্ষে?

কিন্তু বোঝাবে কাকে? মা তো কিছু বুঝবেনই না, দাদারাও না, বাবাও কেমন অবুঝ হ'য়ে গেছেন। তবু সে বাবাকেই ধরলো, বাবার উপরই তার জোর খাটে সবচেয়ে বেশি।

'এ বিয়ে আমি করবো না বাবা।'

'কেন?' সন্তোষবাবু হকচকিয়ে গেলেন।

'লোকটা নাকি টাকা চায়?'

'তা তো চাইবেই।'

'কেন চাইবে?'

'চুনোপুঁটিরাই চায় আর এ তো —'

'আমাকে কি দয়া করছে?'

'দয়া আবার কী।'

'আমি কানাও না, খোঁড়াও না, হাবা বোবাও না যে টাকা নিয়ে আমাকে উদ্ধার করবে। আর নিজের তো ধন সম্পদের অভাব নেই শুনছি, তবে এমন কাঙালের মতো স্বভাব কেন?'

'মেয়ে বিয়ে দিতে গেলে এ-রকম লাগেই। তার উপর কী রকম একটা মানুষ, এ টাকাতো সামান্য।'

'সামান্য নিয়ে তার আর হাত কালি করা কেন? দাদা বলেছে ভীষণ খাঁই। রূপোর বাসন চেয়েছে। আবার বলেছে লেখাপড়া জানা মেয়ে দিয়ে আমি কী করবো? তাকে তো আর চাকরি করতে হবে না।'

'তা ঠিকই তো। তোকে তো আর চাকরি করতে হবে না।'

'মানুষ কি শুধু চাকরির জন্যই পড়াশুনো করে? চাকরি ছাড়া কি আর কোনো মূল্য নেই?'

সন্তোষবাবু রণে ভঙ্গ দিতে চেয়ে বললেন, 'আচ্ছা আচ্ছা, আগে একদিন এসে দেখেই যাক না, পছন্দ হ'লে তবে তো কথা?'

'কার পছন্দ হ'লে?'

বিপদ বুঝে সন্তোষবাবু বললেন, 'দুজনেরই।'

নন্দিনী নিরস্ত হ'লো। না হয়েই বা কী করবে, বাড়ির যা হাওয়া দেখছে এ-থেকে ত্রাণ আছে ব'লে মনে হচ্ছে না। সকলের চোখে-মুখেই কী সাংঘাতিক উৎসাহ আগ্রহ। আবার সতর্কতা। পাছে ফসকে যায়। নিজেদের এরা সামান্য মনে করে। নবীন মিত্র একেবারে সিংহের বিক্রম নিয়ে এই নকুল কুলে দণ্ডায়মান। বাড়িতে কানু বিনে গীত নেই। ওঁরা ভাবতেই পারছেন না ঐ রাজাধিরাজ কী ক'রে এই কুঁড়ে ঘরের মেয়েটিকে দেখতে চেয়েছেন।

এতোগুলো লোকের এতো শ্রদ্ধা এতো ভক্তি এতো প্রশংসা, এমন আনুগত্য দেখতে দেখতে শেষ পর্যন্ত নন্দিনাও যেন কোথায় একটু কৌতূহলাক্রান্ত হ'যে পড়েছিলো। দেখতে আসার দিন স্থির হ'য়ে গেলে যেন সামান্য অপেক্ষাও ছিলো মনের মধ্যে।

যেদিন আসবে সেদিন একেবারে হুলুস্থুল প'ড়ে গেলো বাড়িতে। সত্যি যেন প্রজার ঘরে রাজা আসছেন। সন্ধ্যা ছ'টায় আসার কথা ছিলো ঠিক ছ'টাতে এসেই হর্ন দিলো গাড়ির। বাবা বারান্দায়ই দাঁড়িয়ে ছিলেন, দৌড়ে কাছে গেলেন, দাদারা হুমড়ি খেয়ে পড়লো, মা ঠাকুমা মরি কি পড়ি ক'রে জানালায়। নন্দিনী সেজে গুজে ব'সে এদের অবস্থাটা অনুধাবন করতে লাগলো।

ভেবে রাখা হয়েছিলো নবীন মিত্র এসে বসলে সামান্য আলাপের পর জল খাবার নিয়ে প্রবেশ করবে নন্দিনী। ডেকোরেটরের দোকান

থেকে ভালো-ভালো প্লেট গ্লাস ভাড়া ক'রে আনা হয়েছে, একটা মখমলের গদি এনেছে, পাঞ্চ লাইট পর্যন্ত জ্বালিয়ে রাখা হয়েছে সাজানো ঘরে। একেবারে পুরো নাটক। কিন্তু কার্যকালে দেখা গেলো বড়ো মানুষটি মচমচিয়ে নেমেই জলদ গম্ভীর গলায় হুকুম দিলেন, তার সময় খুব কম, তাড়াতাড়ি মেয়ে নিয়ে আসা হোক। শুনেই নন্দিনীর আপাদ মস্তক জ্বলে গেলো। একাই এসেছে। সঙ্গে ড্রাইভার আর একজন ভৃত্য।

সারাদিন ধ'রে গরমে ঘামে জব জবিয়ে ব'সে মা কতো খাবার করেছেন, ক্ষিপ্রহাতে তা সাজিয়ে দিলেন ভাড়া করা কাচের প্লেটে, সুবোধ প্রবোধ বিজন হন্ত-দন্ত হ'য়ে নিয়ে গেলো, তালপাতার পাখা দিয়ে বাতাস করতে লাগলো, বাবা হাত কচলাতে লাগলেন, মা ঠাকুমা তাকিয়ে রইলেন পর্দা ফাঁক ক'রে। নন্দিনী গিয়ে বসলো মুখোমুখি। সপ্রতিভভাবে তাকিয়ে দেখলো লোকটিকে। বেঁটে খাটো বলিষ্ঠ চেহারা, কর্কশ চুল, কর্কশ দাড়ি, বয়স্ক মুখ।

তীরের মতো প্রশ্ন এলো, 'রান্না জানেন ?'

মুহূর্তের জন্য থমকালো নন্দিনী। তারপর স্পষ্ট গলায় বললো, 'না।'

সন্তোষবাবু হা হা ক'রে উঠলেন, 'সে কী কথা ? তুই তো খুব ভালো রান্না জানিস।'

অনুগতের মতো দাঁড়িয়ে অন্য দাদারা ভ্রুকুটি করলো। ভিতর থেকে মা ঠাকুমা দাঁতে-দাঁত ঘ'ষে কপাল চাপড়ালেন।

এর পরের প্রশ্ন, 'তা হ'লে কী জানেন ?'

'যৎ সামান্য লেখাপড়া শিখেছি — '

'সে সব আপনার কী কাজে লাগবে ?'

'এই কিছুটা ভদ্রতা সভ্যতা কাণ্ডজ্ঞান — '

'মানে ?'

'মানে লেখাপড়া শিখলে মানুষে-পশুতে কোথায় তফাৎ এ-সব জানা যায়, মনুষ্যত্ব অর্জন করা যায় কথাবার্তা বলা যায় আর — '

'আর বাচাল হওয়া যায় — পুরুষের সমকক্ষতা দাবী করা যায় — '

'ঠিক। আসল কথাটা বলতেই আমি ভুলে গিয়েছিলাম। লেখাপড়া শিখলে আত্মসম্মান ব'লে যে একটা পদার্থ আছে সেই বৃত্তিটা অন্তত জাগ্রত হয়। অনেক ধন্যবাদ।'

'হুঁ।' ঘড়ি দেখলেন নবীন মিত্র, 'বি. এ. পাস করেছেন কোন বছর? বয়েস কতো? আশাকরি সেটা লুকোবেন না।'

চুপ ক'রে থেকে নন্দিনী বললো, 'আপনি কোন বছরের বি. এ.? আপনার বয়েস কতো?'

নবীন মিত্রের চোয়াল শক্ত হ'লো, বড়ো নিঃশ্বাসে বুক ফুলিয়ে খাদের গলায় বললেন, 'আমার পরিচয় আমার কাজে। এই ঘরটুকুতে ব'সে আপনি তার পরিমাপ করতে পারবেন না। সুতরাং এই প্রশ্নের জবাব আমি দেবো না।'

সবেগে উঠে পড়লেন, ঐ ঘরের যে সব পরিজনেরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ম'রে গিয়েছিলো, হিংস্রভাবে তাকালেন সকলের দিকে, দাঁতে দাঁত চেপে বললেন 'ঠিক আছে।' তারপর কোনো বিদায়-আদায় না নিয়ে সোজা গিয়ে গাড়িতে বসলেন।

তৎক্ষণাৎ মরা মানুষগুলো জেগে উঠলো। প্রত্যেকে সৈনিক হ'য়ে গেলো, বেয়নেট বন্দুক লাঠি সব চার্জ করলো একযোগে। একা নন্দিনী সপ্তরথী বেষ্টিত অভিমন্যুর মতো অসহায় যুদ্ধে মার খেতে খেতে ধরাশায়ী হ'লো।

বলাই বাহুল্য বাড়ির আবহাওয়া আর এরপরে তার পক্ষে অনুকূল থাকার কোনো কারণ নেই। ছেলেবেলায় যতো আদর দিয়েছিলো সেই খেদে চরম নিষ্ঠুর ব্যবহার ক'রে সবাই যেন তার শোধ তুলতে লাগলো। কারো বাক্যালাপ নেই তার সঙ্গে, কোনো সহযোগিতা নেই। কেউ তার খোঁজ করে না, খেতে দিতে হয় তাই দেয়, শুতে দিতে হয় তাই দেয়, বাড়িতে থাকলে রইলো, বেরিয়ে গেলে গেলো, যা খুশি করো, বেঁচে থাকো অথবা ম'রে যাও, আর

কিছুতেই কিছু এসে যায় না কারো। এমন কি যে বাবার কাছে তার সাত খুন মাপ, তিনিও নিশ্চুপ। জীবন অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠলো। মনে হ'লো এর চেয়ে ঐ বয়স্ক বেঁটে বড়োলোকটির সঙ্গে বিয়ে হওয়াও বুঝি ঢের ভালো ছিলো। এর চেয়ে আর কী বেশি শাস্তি সে তাকে দিতে পারতো?

মাঝে মাঝে ওস্তাদজির কুটিরে যায়, গিয়ে ব'সে থাকে। সেইটুকুই যা শান্তি। কিন্তু গান আর সে শেখে না, গান করার মতো ইচ্ছে জন্মের মতো ঘুচে গেছে। কী হবে এসব ক'রে? সত্যিই তো একজন মেয়ের জীবনে এর কী মূল্য?

লুকিয়ে-পালিয়ে কলকাতা যাবার কথা ভেবেছিলো। আর যাই হোক জোর-জার ক'রে বি. এ. টা তো পাস ক'রে নিয়েছে, সেইটকু তো কেউ আর কেড়ে নিতে পারবে না? একাদিক্রমে চার বছর কলকাতা থাকায় পরিচিত বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যাও খুব নগণ্য ছিলো না সেখানে। কোথাও গিয়ে উঠে একটা চাকরি-বাকরি নিশ্চয়ই জোগাড় ক'রে নিতে পারবে। কিছু না হ'লে অন্তত কয়েকটা টিউশনি জুটবে নিশ্চয়ই। বন্ধুরাই জুটিয়ে দেবে। তবু স্বাধীন জীবন হবে, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে পারলে বেঁচে থাকারও অর্থ হবে।

এখানে তার কিছুই আশা করবার নেই, পাবার নেই। সত্যি বলতে তার একার জন্যই সে সেদিন ভদ্রলোকটির সঙ্গে ওভাবে কথা বলেনি, তার মধ্যে তার সারা পরিবারের সম্মানও জড়িত ছিলো। হ'তে পারে তার বাবা একজন সামান্য মানুষ, কিন্তু সামান্য অসামান্যের তো কথা নয়, কথা হচ্ছে কী অধিকারে অমন প্রভুর মতো ব্যবহার করবেন তিনি। ভদ্রতা-সভ্যতা ব'লেও তো কিছু আছে। কেন, বাবা কি ওর কাছে টাকা ধার করেছেন? অধীনে চাকরি করেন? না কি কিছুরি প্রার্থী তিনি?

এইখানেই খটকা লাগলো। প্রার্থী তো বটেই। মেয়েকে যদি দয়া ক'রে পায়ে ঠাঁই দেন এ-কথাটা কি এদের প্রত্যেকের মুখে-চোখেই একেবারে খোদাই ক'রে লেখা ছিলো না?

১৫

এর মধ্যেই একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘ'টে গেলো। দিন দশেক বাদে নবীন মিত্র একটি চিঠি দিয়ে একটি লোককে পাঠিয়ে দিলেন, যে চিঠি প'ড়ে বাড়ির সবাই মূর্ছা গেলো এবং মৃত বাড়ি হঠাৎ প্রাণ পেয়ে জেগে উঠে ন'ড়ে-চ'ড়ে বসলো!

চিঠিটি সংক্ষিপ্ত। লিখেছেন, মেয়ে আমার পছন্দ হয়েছে, যদি আপনাদের কোনো আপত্তি না থাকে এবং আপনাদের মেয়ে অসম্মতি না জানায় তা হ'লে আগামী সতেরোই বৈশাখ আমি বিবাহের দিন স্থির করতে চাই। বিবাহের যৌতুক হিশেবে আপনাদের কন্যা ছাড়া আর কিছুই আমার চাহিদা নেই। ভবদীয় নবীন চন্দ্র মিত্র মজুমদার।

সন্তোষবাবু হঠাৎ মেয়েকে জড়িয়ে ধ'রে কাঁদতে লাগলেন। দাদারা বোনকে নতুন দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলো। মা ঠাকুমা আর মা ঠাকুমা রইলেন না, সেবিকা হ'য়ে গেলেন। আর নন্দিনী দিশাহারা হ'লো। সে বুঝতে পারলো না মিত্র মজুমদার মশায়ের সহসা এই দাক্ষিণ্যের কারণটা কী। যাই হোক, এনিয়ে আর কোনো গোলমাল করবার মতো তার শক্তি ছিলো না। নিজেকে সে অদৃষ্টের হাতে ছেড়ে দিলো। ক্লান্ত হ'য়ে বললো, 'তোমরা যা ভালো বোঝো করো, আমার কিছু বলবার নেই।'

বাড়ি উৎসবের আনন্দে গমগমে হ'য়ে উঠলো। ছেলে কিছু চায়নি সেই আনন্দে সন্তোষবাবু অবস্থার অতিরিক্ত খরচ ক'রে প্রায় রিক্ত হলেন, দিদিরা বোনের উপযুক্ত কী উপহার দেয়া যায় সেটা ভেবে-ভেবে অস্থির হ'য়ে গেলেন, দাদারা খেটে-খেটে গলদঘর্ম হ'লো, দেখতে-দেখতে এসে পড়লো তারিখ। নন্দিনী নিজের ঘরে স্বেচ্ছাবন্দী হ'লো।

মা ঠাকুমা একেবারে অনুকোটি চৌষট্টি নিয়ম কানুনের হাত ধ'রে

চলছিলেন, কোথাও যেন কোনো ত্রুটি না হয়, সেই ত্রুটির ছিদ্র ধ'রে যেন কোনো অমঙ্গল না প্রবেশ করে মেয়ের জীবনে। কোথার থেকে কোথার সহায়কারী আত্মীয় স্বজনও এসে গেলো অনেক, শহরের সব বাঙালী একত্রিত হ'লো।

বিয়ের লগ্ন ছিলো শেষ রাত্রে বিয়ে শেষ হ'তে হ'তে প্রায় ভোর। সেই রাত্রে আর আলাপ হ'লো না স্বামীর সঙ্গে। পরের দিন শ্বশুর বাড়ি এলো।

বাড়ি দেখে নন্দিনী সত্যিই তাজ্জব ব'নে গিয়েছিলো। এতোবড়ো একটা বাড়ি তার ধারণার মধ্যেই ছিলো না। বাড়ি নয়, বস্তুতই প্রাসাদ।

সস্নেহে শাশুড়ি ঘরে তুলে নিলেন। ননদ আদর করলো। নন্দাই ঠাট্টা করলো, কাঁচা বয়সের দেওর ঘুর-ঘুর করতে লাগলো কাছে কাছে। আরো পাঁচজন আত্মীয়-পরিজন এগিয়ে এসে বৌ দেখে ধন্য ধন্য করলো। সেই রাতটা এদের সঙ্গে বেশ ভালোই কাটলো তার। ভয় ক'মে গেলো, আপনজনদের ছেড়ে আসার বেদনায় দীর্ণ বুকে প্রলেপ পড়লো একটু।

স্বামীর সঙ্গে মুখোমুখি হ'লো একেবারে ফুল শয্যার রাত্রে। সেখানকার নিয়ম অনুযায়ী বৌ-ভাতের খাওয়া-দাওয়া দুপুরেই সাঙ্গ হ'য়ে গেছে। বেশি হৈ-চৈ ছিলো না, লোকজন খুবই কম ছিলো বলা যায়, এমন কি তার বাপের বাড়ির লোকেদেরও এরা বলেনি। শুধু তিন দাদা আর বাবা।

বাবা জল ভরা চোখে রাজরানী মেয়েকে বুকে চেপে আদর করলেন, গয়নার ভারে নন্দিনী অবনত হ'য়ে রইলো। দাদারাও বিস্ফারিত চোখে সোনা মোড়া বোনকে দেখে তৃপ্তি লাভ করলো।

সন্ধে লাগতে লাগতেই বাড়ি ফাঁকা। শোনা গেলো রাত সাড়ে ন'টার মধ্যে শুয়ে না পড়লে নবীনের মেজাজ খারাপ হয়। এখানে আসার এই দু'দিনের মধ্যেই নবীন বিষয়ে এই একটা কথা নন্দিনী

অনেকবার শুনেছে। এ-বাড়িতে নবীন যে একজন সাংঘাতিক সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী সে-কথা তার মা বোন ভাই আত্মীয় বন্ধু কর্মচারী প্রত্যেকের মুখেই ছাপ মারা ছিলো।

সুতরাং সাড়ে ন'টা বাজতেই তড়িঘড়ি শুভ রাত্রির আমোদ আহ্লাদ সাঙ্গ ক'রে পরিজনেরা তাদের একা হ'তে দিলো। নবীন ছিটকিনি তুলে দিলো দরজার, আলো নিবিয়ে দিলো। শুধু সবার উপরে মঙ্গল প্রদীপটা জ্বলতে লাগলো। ধীরে ধীরে ছায়াটা দেয়ালে কাঁপতে লাগলো।

নন্দিনী সেই ঝাপসা আলোয় দেখলো তার স্বামী অনাবৃত হ'লো। ধুতি খুলে নির্লজ্জের মতো আণ্ডারওয়ার পরে উঠে এলো বিছানায়। হাতের সাপটে খাট থেকে ঝেড়ে ফেললো ফুলগুলো, শুয়ে পড়তে পড়তে বললো, 'ব'সে আছো কেন? ওসব জরজং শাড়ি গয়নাগুলো পরেই শোবে নাকি?'

নন্দিনী উঠলো। ড্রেসিং টেবিলের সামনে ব'সে আস্তে আস্তে খুললো সব। এরা সত্যি অনেক গয়না দিয়েছে। প্রত্যেকটাতে পাথরের মতো ভারি সোনা। ননদ বলছিলো এগুলো নাকি তার দাদা অনেক আগে থেকেই তৈরি ক'রে রেখেছিলো বৌর জন্য। নন্দাই হেসে বলেছিলেন, 'অর্থাৎ সে বছর সোনার দর হঠাৎ এতো নেমে গেলো যে, গয়নার নামে তোমার দাদা অমনি সোনা সঞ্চয় ক'রে রাখলেন। নবীনবাবুর মতো ব্যবসায়ী মাথার ছিঁটে ফোঁটাও যদি পেতাম তা হ'লে বেচারা তুমি এর চেয়ে একটু বেশী সুখে থাকতে পারতে!' ননদ ভ্রূকুটি করলো।

গয়না খুলতে সময় লাগলো। রাশিকৃত চুড়ি চূড় বালা কঙ্কন ব্রেসলেট, আর্মলেট, গলার তিন ছড়া হার, সোনার কণ্ঠি, পাথরের নেকলেস, মাথায় সিঁথী, কানে ঝুমকো মনে হচ্ছিলো অনন্ত কাল ধ'রে খুলছে।

বেনারসীটাও ছাড়া দরকার। ব্রোকেড বেনারসী, যেমন ভারি তেমন ঝকমকে। ঘরের চারদিকে তাকিয়ে নন্দিনী বদলাবার জন্য

একখানা সাধারণ শাড়ি খুঁজলো। পেলো না। সিটকিনি খুলে বাইরে যাচ্ছিলো, নবীন বললো, 'কোথায় যাচ্ছো?'

'শাড়ি বদলাতে।'

'শুচ্ছো তো স্বামীর সঙ্গে, ঘরেও কেউ নেই, শাড়ি বদলে শাড়ি পরবার অভিনয়টা কার জন্য?'

কথা শুনে নন্দিনী স্তম্ভিত। ফিরে তাকিয়ে দরজা খুলে বারান্দায় এসে দাঁড়ালো। খোলা বারান্দা, সুন্দর হাওয়া আসছিলো, আকাশের দিকে মুখ তুলে দাঁড়িয়ে থাকলো কিছুক্ষণ। কৃষ্ণপক্ষ, কালো আকাশের বুকে তারাগুলো সোনাবুটি হ'য়ে ঝলমল করছে। এরি মধ্যে নিশুতি হ'য়ে গেছে সারা বাড়ি। একজন ঝি এগিয়ে এলো তাকে দেখে, 'কী বৌদি, কিছু চাই?' ব্যস্ত হ'য়ে সে জিজ্ঞাসা করলো।

'আমি শাড়িটা ছাড়বো।'

'ও আসুন আমার সঙ্গে।' কাপড় ছাড়বার ঘরে নিয়ে গেলো সে, ননদ ছুটে এলো, সাহায্য করলো শাড়ি ছাড়তে, ঝি বেনারসিটা তুলে রাখলো ভাঁজ ক'রে।

শাড়ি বদলে নন্দিনী ঘরে ফিরে এসে দেখলো আলো জ্বলছে, শায়িত নবীন উঠে ব'সে আছে আসন পিঁড়ি হ'য়ে, প্রশস্ত ঘর, নতুন নতুন জিনিশে-পত্রে ঠাসা। ঘরের মাঝামাঝি এসে চুপ ক'রে দাঁড়ালো সে। স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে রোমাঞ্চের বদলে কেমন ভয় হ'লো তার। সে মুখ কী এক কঠিন প্রতিজ্ঞায় দৃঢ়বদ্ধ।

নবীন বললো, 'শোনো।'

নন্দিনী বললো, 'বলুন।'

'এ-বাড়ি আমার, এ-বাড়ির প্রত্যেকটি ইঁট আমার পয়সায় কেনা, প্রত্যেকটি লোক আমার উপার্জনে খায়, প্রত্যেকটি লোক আমার হুকুমে চলে।'

নন্দিনী চুপ ক'রে তাকিয়ে রইলো।

'আমি তোমাকে নিষেধ করা সত্ত্বেও তুমি দরজা খুলে বাইরে গেছো, আজ প্রথম দিন ব'লে আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম, কিন্তু

এই 'মিত্র ক্যাসেলে' থাকতে হ'লে আর কখনো যেন এর পুনরাবৃত্তি না হয়।'

নন্দিনী চুপ।

'মনে থাকবে?'

নন্দিনী চুপ।

হঠাৎ নেমে এলো নবীন, আলো নেবালো এসে। তারপর স্ত্রীকে প্রায় কোলে ক'রে তুলে নিয়ে এলো বিছানায়। বুকের তলায় পিষ্ট করতে করতে বললো 'তোমাকে দেখে কোন পুরুষ মাথার ঠিক রাখতে পারে? আমিও না।'

বলিষ্ঠ নবীনের ভয়ঙ্কর কামনার আসুরিক শক্তিতে সেই রাত্রে নন্দিনী প্রায় অর্ধমৃতের মতো প'ড়ে রইলো। সকালে উঠে তার পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করলো। কিন্তু কোথায় যাবে? বাপের বাড়ি? অসম্ভব।

১৬

হিন্দুবিবাহের একটা নিয়ম আছে, দ্বিরাগমন। নবীন বললো, 'ওসবের জন্য আমি সময় নষ্ট করতে পারবো না। বিয়ে করেছি ব'লেই যার-তার বাড়ি গিয়ে থাকা আমার পোষাবে না। তাদের মেয়ে যদি যেতে চায় যাক, কিন্তু রাত্রিবেলা ফিরে আসতে হবে।'

সন্তোষবাবু এসে প্রায় হাতে পায়ে ধরলেন। অনেক বাবাজীবন বাবাজীবন করলেন, বৈবাহিকাকে সজল নয়নে অনুরোধ জানালেন, কিন্তু নবীন তাতে একচুল হেললো না, তার অটুট গাম্ভীর্য এতোটুকু টোল খেলো না। সে হ'লো কর্মবীর, কতো তার কাজ, কতো ধরণের বাণিজ্য, তার সময় কোথায়? আর ছেলের উপরে কথা বলবেন এতো শক্তি তার মায়ের নেই।

অতএব মেয়েকেই একা নিয়ে যেতে চাইলেন। চুপ ক'রে থেকে নন্দিনী বললো, 'আমি যাবো না।'

'যাবি না।' সন্তোষবাবুর গলা বন্ধ হ'য়ে এলো।

'না।'

'তোর মা কান্নাকাটি করবেন।'

'রাজার ঘরে মেয়ে দিয়েছেন, আবার কান্নাকাটি কিসের?'

জামাইয়ের ধাত সন্তোষবাবু একদিনেই বুঝে নিয়েছিলেন, মেয়ের কথায় নিরুত্তর হলেন। নন্দিনী শুকনো চোখে অন্যদিকে তাকিয়ে রইলো। অনেক পরে বললো, 'বাবা, আমাকে একবার ওস্তাদজির কাছে নিয়ে যেতে পারো?'

সন্তোষবাবু অবাক হ'য়ে বললেন, 'আমাদের কাছে যাবি না, আর মামুদের কাছে যাবি?'

'উনি সন্ন্যাসী মানুষ, তাঁর ঘরে ঈশ্বর আছেন, সেখানে শান্তি আছে। তাছাড়া তোমাদের কাছে গেলে ফিরতে ইচ্ছে করবে না, ওঁর কাছে গেলে তো আর সে ইচ্ছের প্রশ্ন নেই। বাবা, ইচ্ছের সঙ্গে এখানে আমাকে অনেক যুদ্ধ করতে হয়। সে ক্লান্তি আর আমি বাড়াতে চাই না।'

নবীনের কাজ-কর্ম চলা-ফেরা সবই নিয়মে বাঁধা। ভোর পাঁচটায় ঘুম ভাঙে, উঠেই সামান্য ব্যায়াম ক'রে শরীরটাকে সতেজ ক'রে নেয়, তারপর মুখ হাত ধোয়। মুখ হাত ধুয়ে ফিরে আসতে আসতেই তার মা দৌড়ে বেলের সরবৎ এনে দেন, এক মিনিট এদিক ওদিক হ'লে চলবে না। তারপরে সে দাড়ি কামায় দেয়ালে টাঙানো বড়ো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে, লোমশ বুকের উপর তোয়ালে পাতা থাকে, ছপ ছপ সাবান ছিটকোয় আয়নাটা ক্ষত-বিক্ষত হয়। দাড়ি কামিয়ে যতোক্ষণে সে স্নান ক'রে আসে, ততোক্ষণে আবার স্বচ্ছ ক'রে রাখতে হয় আয়না, ঘর ঝেড়ে মুছে তকতকে ক'রে তুলতে হয়। নবীন বাথরুমে যাওয়া মাত্র এই কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে গৃহসেবক জগন্নাথ।

শীত গ্রীষ্ম বারো মাস সে ঠাণ্ডা জলে স্নান করে। ঘড়ি দেখে

পাঁচ মিনিট হুস হুস ক'রে জল ঢালে গায়ে। মস্ত বড়ো ড্রামটা একেবারে ফাঁকা হ'য়ে যায়। গা মোছে না, মাথা মুছে গায়ে তোয়ালে জড়িয়ে ফিরে এসে সেই স্বচ্ছ আর্শিতে তাকিয়ে অনেকক্ষণ ধ'রে মাথা আঁচড়ায়। কেননা সে জানে অনেকক্ষণ ধ'রে মাথা আঁচড়ালে মাথার রক্ত চলাচল ভালো থাকে। প্রাতঃকালীন আহার গ্রীষ্মকালে দই চিড়ে কলা, শীতকালে রুটি মাখন ডিম সন্দেশ! সেই সন্দেশ বাজারের নয়, ঘরের তৈরি, টাটকা ছানা দিয়ে। খাবার পরে সামান্য ছেদ দিয়ে পুরো এক গ্লাস জল ঢক ঢক শব্দ ক'রে পান করে। বেরুবার জন্য পোষাক পরে তৈরি হ'তে আর বেশি সময় খরচ করে না।

চাকর-বাকরের কাজ তার পছন্দ নয়, তারা মোতায়েন থাকে বাইরের কাজের জন্য। ঘরের কাজে মুখ্য সেবিকা তাঁর মা-ই। তবে সহকারিণীও আছে দু'একজন। তাই ব'লে তার ব্যক্তিগত কাজে পরিচারক-পরিচারিকাদের কোনো অংশ নেই। খাওয়া-দাওয়া পোষাক-পরিচ্ছদ মা-ই এগিয়ে-পিছিয়ে দিয়েছেন এতোকাল, এখন নন্দিনী দেয়।

প্যাণ্ট নিভাঁজ রাখতে হয়, সার্ট-ইস্তিরি ক'রে রাখতে হয়, পরিষ্কার কাচা গেঞ্জি এগিয়ে দিতে হয়, দু'খানা পাট করা রুমাল দিতে হয়। মাথা আঁচড়াবার নির্দিষ্ট চিরুণীখানাও হাতে হাতে চাই। সব শেষে বেরুবার আগে এক কাপ পাতলা দুধ বিহীন চা।

অর্থাৎ সকালবেলা পাঁচটায় উঠে বেলা সাড়ে আটটা পর্যন্ত, যতোক্ষণ না নবীন কাজে বেরোয় ততোক্ষণ দু'জন মেয়ে, মা আর বৌ (আগে ছিলো মা আর খ্যান্ত ঝি) হিমসিম খেতে থাকে। কাজ বেশির জন্য নয়, অনবরত সচকিত থাকার পরিশ্রমেই তারা কাতর হয় বেশি। নবীনের মেজাজ সর্বদাই তিরিক্ষি। এক বিন্দু এপাশ-ওপাশ হলেই তার সাংঘাতিক ভারি আওয়াজ বজ্রের মতো ফেটে পড়ে, চোখের সাদা লাল হ'য়ে যায়, লোমশ বলিষ্ঠ হাতের বেঁটে মোটা আঙুলের থাবা থেকে থেকে মুঠো হ'তে থাকে। সব্বাই ভয়ে কাঁপে।

১৭

সংসারে মেয়েদের শুধু ঐটুকুই কাজ নয়। রান্নাটাও তাদের হাতে। তাদের মানে মায়েব হাতে। কারবারী লোকের বাড়ি, এক এক বেলায় কম ক'রে অন্তত ষোলো-সতেরো জন লোক খায়। নন্দিনী দেখছে সেই সতেরো জনের রান্না একা হাতে শাশুড়ি করেন। হাঁড়ি নামাতে বেঁকে যান। এদের টাকার অন্ত নেই, তবু যে কেন নবীন মাকে এমন দাসীর মতো খাটায় একথা ভেবে পেতো না নন্দিনী। মহিলার বয়েসও তো হয়েছে। আব শুধুই কি রান্না? সকালে বিকেলে জল খাবার আছে না? আমলা ফয়লা মুহুরি ম্যানেজাব ব্যবসায়ের বহুলোক এ-বাড়িতে খায়। একজন ড্রাইভার আছে, দু'জন গোরু রাখার লোক আছে, ফরমাস খাটার আলাদা ছোকরা, সঙ্গে ঘোরবার আলাদা দরোয়ান, বাড়ি পরিষ্কারের লোক, বাসন ধোয়া কাপড় কাচার ঝি — সক্কলেব রান্না এ-বাড়িতে। খেতে দিলে মাইনে কম দিতে হয়, অনেকে আবাব পেটে-ভাতেও আছে, তাছাড়া খাবার নাম ক'রে লোকগুলো ঘরে গিয়ে সময় নষ্ট করতে পারে না, সেটাও লাভ। নবীনের বাড়িতে ভাতের অভাব নেই। কিছু ধান জমি আছে তার, বছরের চাল সেখান থেকেই উঠে আসে। আর তো খেসারির ডালের ঘ্যাট কুমড়ো দিয়ে। অকথ্য দারিদ্র, লোকগুলো তাইতেই লুটিয়ে কাজ করে।

বাড়িতে আর কে মেয়ে আছে? ঐ তো মা। মাকেই করতে হয় সব। ননদ বিয়ে উপলক্ষ্যে এসেছিলো, চ'লে গেছে স্বামীর সঙ্গে। যাবার সময় ব'লে গেছে, 'মাকে দেখো।'

একথা শুনে ননদের মুখের দিকে তাকিয়েছিলো নন্দিনী, ননদ হেসে বলেছিলো, 'দেখতে পাচ্ছো না মেয়েদের দাদা কী ভাবে? তারা সেবাদাসী। আমিও তাই ছিলাম। তবু মার সাহায্য হ'তো, এখন তো একেবারে সঙ্গীহীন।'

নন্দিনী সরল ভাবে জিজ্ঞাসা করলো, 'ওখানে গিয়ে তুমি ভালো আছো ?'

ননদ সরল মুখে হাসলো, বৌদিকে জড়িয়ে ধ'রে আদর ক'রে বললো, 'মানুষটাকে তুমি দেখছো না ? বৌদি, ভালোবাসার মতো ভালো আর কিছু নেই। সেটা আমি ষোলো আনার জায়গায় আঠারো আনা পেয়েছি। কিন্তু মার জন্য দুঃখ লেগে আছে সব সময়ে। তুমি আছো ভেবে এবার মনটা অনেক হালকা লাগছে।' তারপরেই তার চোখ জলে ভ'রে উঠলো, 'এখন তোমার জন্যও আমাব মন কেমন করবে।'

স্বামীকে নন্দিনী বলেছিলো, 'মার পক্ষে এতো লোকের রান্না কবা খুব কষ্টকর।'

নবীন তাকিয়ে থেকে জবাব দিয়েছিলো, 'রান্না ছাড়া স্ত্রীলোক আর কি করবে ?'

তর্কের মধ্যে না গিয়ে নন্দিনী জবাব দিয়েছিলো, 'অনেকদিন তো করেছেন, এবার না হয় বিশ্রাম দাও।'

'সে কথা তোমাকে মনে করিয়ে দিতে হবে না। সে জন্যই শেষ পর্যন্ত বিয়ে করা দরকার মনে হ'লো।'

'শুধু সেই জন্যই বিয়ে করেছ ?'

'তোমার বোধহয় ধারণা তোমার বিদ্যা দেখে আমি মূর্ছা গিয়েছিলাম ?'

'না।'

'তবে ? রূপ ?'

'না।'

'তবে ?'

'রান্না করবার জন্যেই।'

'আর রাত্তিরে শোবার জন্য। সকালে উঠে ফ্রেস লাগে, কাজে-কর্মে উদ্দীপনা হয়।

নন্দিনী অন্যদিকে তাকালো। হাসতে হাসতে নবীন বললো, বাইরের মেয়েমানুষগুলোকে ঘেন্না করে, ফট ক'রে একটা ব্যারাম-স্যারাম হ'য়ে পড়তেই বাধা কী। তার উপর যা পয়সা খরচ।'

'ছি।' শব্দটা নন্দিনীর গলা থেকে স্খলিত হ'লো। আর পয়সার লোভে বি. এ. পাস ভদ্রলোকের মেয়েরাও ম্যাট্রিক ফেল পাত্রের গলায় মালা দেয় কিনা সেটা দেখবারও একটা লোভ ছিলো বৈকি? নবীন সগৌরবে অপলক হ'লো স্ত্রীর দিকে।

এরপরে নন্দিনী চুপ ক'রে গেলো। আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়তে পড়তে আবার হাসলো নবীন, 'অথচ যখন দেখতে গিয়েছিলাম, কী চ্যাটাং চ্যাটাং কথা। নবীনচন্দ্র মিত্র মজুমদারের জেদ তো জানো না। ওই বেড়ালিকে খাঁচায় আটকাবো এই পণ আমার তখন থেকেই। নিজের সঙ্গে নিজেই একটা বাজী ধরেছিলাম। কিন্তু জানতাম না এতো তাড়াতাড়ি সেই চিতাবাঘিনীকে পেয়ে যাবো আয়ত্বের মধ্যে। এসো।'

অন্ধকারে স্ত্রীর দিকে সে লোভের হাত বাড়িয়ে দিলো।

নিয়মানুবর্তী নবীনচন্দ্রের এই নিয়মেও ব্যতিক্রম নেই। আর নন্দিনারও নিজের দেহ থেকে নিজের মনটাকে বিযুক্ত ক'রে নেবার চেষ্টার অন্ত নেই। তবু পারে কই?

এরপরে শাশুড়ির পাশে গিয়ে দাঁড়ালো সে। বললো, 'এবার আমাকে শিখিয়ে দিন সব।'

সস্নেহে তাকিয়ে শাশুড়ি বললেন, 'পাগল।'

'পাগল কী!'

'এই রান্নাঘরের আগুনে ঐটুকু মেয়ে তোমাকে গুঁজে দেবো আমি?'

'আপনিও তো একদিন ঐটুকুই ছিলেন, নিশ্চয় তখনো পেরেছেন।'

'পারতেই হয়েছে।'

'তবে?'

'কতো কষ্টের কাজ এই প্রতিদিনের রান্না, তা তুমি বুঝবে না।'

'আমি বুঝি। খুব বুঝি। কিন্তু কেন একজন লোক রাখেন না সেটাই বুঝি না।'

'কী করবো? ছেলের খেয়াল।'

'ছেলের খেয়ালটাই সবচেয়ে বড়ো? আপনার কষ্টটা কিছু না?'

'আমার আবার কষ্ট।' দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন তিনি, 'তোমার শ্বশুরও ঠিক এ রকম ছিলেন। ওরা নিজের কথা ছাড়া আর কারো কথা ভাবতে জানে না।'

'আপনিও তেমনি সারাজীবন নিজের কথা ভাবেননি?'

'ভেবে কী করতাম?'

'ভাবলে কিছু একটা করতেন হয়তো।'

'মাগো, মেয়ে হ'য়ে জন্মেছি, পরের ঘরে এসেছি, ও সব কি চলে আমাদের? তোমারও চলবে না। ওদের হৃদয় ব'লে কিছু নেই।'

শাশুড়ি সুন্দরী, সুন্দর গড়ন, এই বয়সেও পিঠ ভর্তি চুল, সোনার মতো রং আগুনে পুড়ে-পুড়ে এখনো নষ্ট হয়নি। শাশুড়িকে নন্দিনী ভালোবাসলো। চেষ্টা করলো তাঁকে সব কষ্ট থেকে মুক্তি দিতে, সব বিষয়ে সাহায্য করতে, সঙ্গীনি হ'তে। শাশুড়িও কাছে নেয়ে তাকে বুকে টেনে নিলেন।

১৮

এই ক'রে করেই কাটতে লাগলো দিন। অতি মন্থর গতিতে, অতি ঢিমে লয়ে। তারপরেই একদিন চমকে গিয়ে টের পেলো সে সন্তান-সম্ভবা। হাত পা হিম হ'য়ে এলো। আমি সন্তান চাই না, চাই না, চাই না। মনে মনে কপাল কুটলো সে। এই লোকেরই তো সন্তান, আবার একটা এই মানুষের জন্ম? এমন নিষ্ঠুর, এমন দুঃখদায়ক?

নবীনের খিটিমিটি আজকাল আরো খানিকটা বেড়েছে।

নন্দিনীর কোনো কাজই তার পছন্দ হচ্ছে না, যতোটা কলের মতো চায়, ততোটা সে পেরে উঠছে না কোনোমতেই। তাই নবীন রেগে যাচ্ছে ঘন ঘন। বাড়ি তোলপাড় হ'য়ে উঠছে সেই তাপে। এটা ফেলছে, সেটা ভাঙছে, সেটা ছুড়ছে, একদিন নন্দিনীকেও একটা ধাক্কা দিলো জোরে। প'ড়ে যেতে যেতে দেয়াল ধ'রে সামলালো সে আর সঙ্গে সঙ্গেই একটা গভীর মমতায় টন টন ক'রে উঠলো বুকটা। কেবলি মনে হ'তে লাগলো ভাগ্যিস সে প'ড়ে যায়নি, ভাগ্যিস কোনো আঘাত লাগেনি। ঈশ্বরকে ডাকলো, প্রার্থনা করলো যে আসছে সে আসুক, সে নিরাপদে থাকুক, শুধু পিতার মূর্তিতে যেন না আসে।

এর পরেই শাশুড়িকে জানালো কথাটা। চুল বেঁধে দিতে দিতে শাশুড়ি অনাবিল ভাবে খুশি হ'য়ে উঠলেন, বৌর মাথার উপর নিজের গাল চেপে আদর করলেন, বললেন, 'ছেলে হোক, মেয়ে হোক, সে যেন তোমাকে বোঝে। তোমার মতো হয়।'

বিবাহের পরে এক বছর কেটেছে ততোদিনে। এর মধ্যে একবারো সে পিত্রালয়ে যায়নি, অথচ এই তো এখান থেকে এখানে, একেবারেই পাশের শহর, মাত্রই দু'চার মাইলের তফাৎ।

সন্তোষবাবু অবশ্য এসেছেন কয়েকবার। জামাইয়ের অনুমতি না পেয়ে নিতে পারেননি মেয়েকে। হতাশ হৃদয়ে ফিরে গেছেন। এবার বৈবাহিকার চিঠি পেয়ে ছুটে এলেন আবার। মুখেচোখে উৎসাহ ঝক-ঝক করতে লাগলো। নন্দিনী এসে দাঁড়ালো নত মুখে, বাবাকে দেখে অভিমান ভুলে এবার মা ঠাকুমাকে দেখার জন্যে দাদাদের জন্যে, বাড়িটার জন্যে তার প্রাণ কাঁদতে লাগলো। শরীর অসহ্য খারাপ হয়েছে, আর সে পারছিলো না।

শাশুড়ি আধো ঘোমটা দিয়ে অন্দরের দরজায় দাঁড়িয়ে সমাদর করলেন, বৈবাহিককে বললেন, 'এবার ওকে নিয়ে যান, এ সময়ে মার কাছে না থাকলে কি বিশ্রাম হয়, যত্ন হয়, অত্যন্ত শরীর খারাপ হয়েছে, কিছু খায় না —'

বৌকে ভিতরে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'সেই যে পাষাণ পুরীতে

ঢুকেছো আর তো বেরুতে পারোনি, এবার যাও টেনে কিছুদিন থেকে এসো। এ-অবস্থায় এ-বাড়িতে থাকা কোনো কাজের কথা নয়। আমার ছেলে কি কিছু বুঝবে? তার নিজেরটা কাঁটায় কাঁটায় হওয়াই আসল।'

নবীন বাড়ি ছিলো না, এলো। জামাইকে দেখে বিগলিত হ'য়ে উঠে দাঁড়ালেন সন্তোষবাবু. 'ভালো আছো বাবা?'

সারা মুখে পৃথিবীর বিরক্তি মেখে নবীন বললো, 'হ্যাঁ।'

'এই — আমি — এসেছিলাম মানে — '

ভিতরে চ'লে যেতে যেতে নবীন দাঁড়ালো, 'কিছু বলবার আছে?'

'না বিশেষ আর কি, বলছিলাম এ-অবস্থায় কিছুদিনের জন্য ওব মার কাছে — '

'না।'

সন্তোষবাবু থতো মতো খেয়ে গেলেন। ঠোঁটে জিব বুলোতে বুলোতে বললেন, 'বিয়ের পবে তো একবাবও গেলো না — এখন এ-সময়ে — '

'আমি মেয়েদের বাপের বাড়ি যাওয়া পছন্দ করি না।'

'এ তুমি কী বলছো, বিয়ে হয়েছে ব'লে মেয়ে তার মা বাবার কাছে যাবে না?'

'আমাব যা মতামত আপনাকে জানালাম, আপনার মেয়েও তা জানে।'

'বাবা, তুমি বুদ্ধিমান ছেলে হয়ে — '

'বুদ্ধিমান বলেই। দেখুন, আপনার মেয়ে এমনিতেই অত্যন্ত উদ্ধত, তার বাধ্যতা-অবাধ্যতার সামিল, সে চুপ ক'রে থাকে বটে কিন্তু সেই চুপ ক'রে থাকাটা চিৎকারের চেয়ে অনেক বেশি। এটা তার চরিত্রের অসহ্য দোষ। এই দোষ আমি একদিন সমূলে উৎপাটিত করবো।'

'বাবা — '

'এবং সেই দোষের জন্যে আপনারাই দায়ী। আপনাদের কাছে গেলে তা বাড়বে বৈ কমবে না।'

সন্তোষবাবু ব্যাকুলভাবে জামাইয়ের হাত জড়িয়ে ধরলেন, নবীন হাত ছাড়িয়ে চ'লে গেলো, তাকে তক্ষুণি আবার বেরুতে হবে। এসব ন্যাকামির সময় কোথায়? সন্তোষবাবু হতভম্বের মতো ব'সে রইলেন।

একটু বাদেই ভিতর থেকে নন্দিনী জামা কাপড় গুছিয়ে নিয়ে এসে বললো, 'চলো বাবা।'

ভয়ে ভয়ে সন্তোষবাবু বললেন, 'কিন্তু জামাই যে —'

নন্দিনী কথাটা শুনেও না শুনে শাশুড়িকে প্রণাম ক'রে বললো, 'যাই মা।'

সন্তোষবাবুর মতো তাঁর চোখে-মুখেও ভয়ের রেখা অস্পষ্ট ছিলো না। তিনিও বললেন, 'কিন্তু ও যে বারণ ক'রে গেলো।'

হাসিমুখে নন্দিনী বললো, 'বারে, আমি কি ছোটো বাচ্চা নাকি নিজে নিজে কিছু করতে পারবো না, বড়োরা শাসন করবে?'

'কিন্তু মা —'

'আপনি কিছু ভাববেন না, আমি কয়েক দিনের মধ্যেই চ'লে আসবো। আমি জানি আমার জন্য আপনারই খুব কষ্ট হবে।'

সন্তোষবাবু বুঝতে পারছিলেন না তাঁর কী করা উচিত, তিনি অসহায়ের মতো, এর ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছিলেন।

'এতো ভাবছো কেন?' নন্দিনী অভয় দিলো, 'চলো, খুব যেতে ইচ্ছে করছে, কতোদিন যাই না —'

এ-কথার পরে আর সন্তোষবাবু থাকতে পারলেন না, দৌড়ে গিয়ে ট্যাকসি ডেকে নিয়ে এলেন।

সম্পূর্ণ এক বছর পরে পিত্রালয়ে এসে বাড়ি ঘর সব নতুন নতুন লাগছিলো। মা ঠাকুমা ছুটে এলেন, বুকে জড়িয়ে ধরলেন, দাদারা এলো, আনন্দের সাগর ব'য়ে গেলো। নন্দিনী নতুন ক'রে উপলব্ধি করলো, আছে, তারও কিছু পাবার আছে এ-সংসারে, এ-বাড়িতে।

খুব শান্তি পেলো সে। কয়েক মুহূর্ত আগের জীবনটাকে যেন ভুলেই গেলো এমন হালকা পায়ে সে ঘরে ঘরে ঘুরতে লাগলো, গাছের তলার ছায়ায় গিয়ে দাঁড়ালো।

ছোট্টো বাংলো প্যাটানের কাঠের বাড়ি, বারান্দা উঠোন মিলিয়ে খোলা মেলা বটে, ঘর মাত্র তিনখানা। আর একখানা খুব ছোটো। সেটাকে গুদাম করেছিলেন নিভাননি, একবার কলকাতা থেকে ফিরে এসে, সেটাকেই পরিষ্কার ক'রে জানালা দরজায় নিজের রঙিন শাড়ি কেটে পর্দা দিয়ে নন্দিনী নিজের ঘর ক'রে গিয়েছিলো। মেয়ের বিবহে মা সেই ঘর তেমনিই গুছিয়ে রেখে দিয়েছেন এক বছর ধ'রে। সেখানে ময়লা কাপড়ের বোঁচকা নেই ক্যালেণ্ডারের ছবি লটকে নেই ট্রাঙ্ক বাকসের ভিড় নেই। ছোটো কেরোসিন কাঠের টেবিল আছে একটা, একটা হাতল ভাঙা চেয়ার আছে। সরু তক্তোপোষ বেডকভারে ঢাকা। আর বই আছে কিছু দেয়ালের তাকে। এ-ঘর এ-বাড়ি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা সম্পূর্ণ অন্যরকম। তখন তার বিয়ে হয়নি, এই চেহারার ঘর নিয়ে সবাই কতো ঠাট্টা টিটকিরি করেছে, খোঁটা দিয়েছে মেমসাহেব হ'য়ে গিয়েছে ব'লে, আবার বিবাহের পরে মেয়েকে পরের ঘরে পাঠিয়ে সেই ঘরই কতো সযত্নে রক্ষিত। সেই ঘরই তাদের মেয়ের প্রতীক। কী অদ্ভুত মন মানুষের। এর নামই হৃদয়-বৃত্তি, তার স্বামী একান্তভাবেই যে বৃত্তির অধীন নয়। না কি কখনো ছিলো? টাকার গরমে, সাফল্যের আধিক্য এমন স্বার্থপর হ'য়ে গেছে? কে জানে।

কেমন একটা করুণা হ'লো। মনে হ'লো, আমি যদি আরো একটু অবনত হই, অনুগত হই, হয়তো মানুষটা এমন কঠোর হ'য়ে থাকতে পারবে না। 'আমি তাই করবো। তুমি যেমন চাও যা চাও নির্বিচারে মেনে নেবো সব। আমি ফেরাবো তোমাকে। তুমি তো এখন শুধু আমার স্বামীই নও, তুমি আমার ভাবী সন্তানের পিতা, জন্মদাতা। তোমাকে ভালোবাসতে পারা আমার কর্তব্য, আমার ধর্ম।'

দেখতে দেখতে পালিয়ে গেলো রোদ, বেলা কখন ফাঁকি দিয়ে বিকেল ঘনিয়ে নিয়ে এলো, আর বাবার মুখে চিন্তার রেখা ঘন হ'লো। আর সবাই খুশিতে কলকল করছিলো, আরো খুশি মেয়ে অন্তঃস্বত্বা হ'লো। ঠাকুমা বলছিলেন, আজ রাতে ওর বিছানা আমার সঙ্গেই পাতো। নন্দিনি বলছিলো, 'আজ আমার সঙ্গেই শুক মা কতো কথা জিজ্ঞাসা করার আছে, জানবার আছে —'

এরই মধ্যে বজ্রপতন হ'লো, সন্তোষবাবু সন্ধে লাগার আগেই বললেন, 'বৃন্দ, তুই কি এখন যাবি?' অবাক হ'য়ে নন্দিনা বললো, 'কোথায়?'

'ভাবছিলাম, সে আবার এসে গোলমাল না করে।'

'কার কথা ভাবছো?'

'আমি জামায়ের কথা ভাবছি।'

'কেন, গোলমাল করবে কেন?'

'তার তো ইচ্ছে ছিলো না?'

'কিন্তু আমার তো ছিলো।'

'তবু সে হ'লো গিয়ে —'

'বাবা, আমার ইচ্ছেটা কি ইচ্ছে নয়?'

'তা তো নিশ্চয়ই, কিন্তু —'

'একজন সাবালক সন্তান তার মা বাপকে দেখতে আসবে এ-জন্য অন্যের কোনো অনুমতি প্রয়োজন ব'লে আমি মানি না।'

'এতোদিন তো মেনেছিস।'

'কী মেনেছি?'

'সে চায়নি বলেই তো আসিসনি।'

'না।'

'তবে?'

'আমি নিজেই চাইনি, তাই আসিনি।'

'তুই নিজেই চাসনি?'

'না।'

'তুই সত্যি আমাদের কাছে আসতে চাসনি ?'

'না।'

'কেন, গরীব ব'লে ?'

'আমি কি এই গরীবের ঘর ছেড়ে স্বেচ্ছায় বড়ো লোকের ঘরে গিয়েছিলাম ?'

'না।'

তবে আর এ-কথা বলছো কেন ?'

'কিসের জন্য তবে আসিসনি ?'

'সে কথা যদি তোমরা না বুঝে থাকো আমি কি ব'লে বোঝাতে পাববো ?'

'নন্দিনী আমাদের উপর অভিমান করেছিলি তুই —।'

নন্দিনী জবাব দিলো না।

'কুন্দ — ' সন্তোষবাবুর গলা কাঁপলো।

'বাবা !' নন্দিনীর গলা কাঁপলো।

দুই বাপ-মেয়ে তারপর আর কোনো কথা বললো না, আকাশ আঁধার হ'য়ে এলো।

১৯

সব শুনে নিভাননি বললেন, 'না বাপু, জামাইকে রাগিয়ে আমি মেয়েকে রাখতে চাই না।' ভয়ে তখন তাঁর আবেগ ক'মে গেছে।

নন্দিনী বললো, 'মেয়েও তো তোমার মানুষ মা, তারও তো কিছু ইচ্ছে অনিচ্ছে, ভালো লাগা মন্দ লাগা, স্নেহ ভালোবাসা, মায়া মমতা মান অপমান বোধ আছে, সে কথাটা কখনো ভাবো না ?'

'কী করবো, ও-সব ভাবলে মেয়েদের চলে না, মেয়েরা পরাধীন।'

'মেয়েদের তবে কী কী চলে ?'

'তর্ক করিস না কুন্দ, আমি বলি তুই বরং চ'লে যা — '

'তা হ'লে যাই।'

'কথা বললেই কেবল রাগ করিস কেন? আমি কি তোর মন্দের জন্যে বলি?'

'আমার আর ভালো মন্দ কী?'

'ভালো মন্দ নেই?'

'যে একজন ব্যক্তি, সুখ দুঃখ ভালো মন্দ তো তারই হ'তে পারে মা।'

'তোর কথা আমি বুঝি না।'

'তাই সুখে আছো।'

'আর তুই বুঝি সুখে নেই? কতো টাকা কড়ি খরচ ক'রে বড়ো লোকের ঘরে বিয়ে দিলুম, গা ভর্তি কতো গয়না, কী দামী শাড়ি, চোখ জুড়িয়ে যায় দেখলে।'

'হুঁ।'

'আর অমন সচ্চরিত্র স্বামী —'

'উঃ —'

'কী হ'লো?'

'কিছু না, এখন যাবো।'

'তা না হয় যাস, চল একটু খেয়ে নিবি —,' মা মেয়ের পিঠে হাত বুলোলেন। নন্দিনী তার উদ্গত দীর্ঘশ্বাস চেপে দিলো বুকের মধ্যে। অনেক পরে হেঁটে জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললো, 'আমার দোষটা কোথায় জানো মা? আমি কিছুতেই ভুলতে পারি না, আমি একজন মানুষ।'

মেয়ের কথাবার্তা কোনোদিনই বোঝেন না নিভাননি, আজও বুঝলেন না। খাবার আনতে গেলেন। নন্দিনী নিজের ঘরে এসে তক্তপোষটার উপরে বসলো একটু, দেয়ালের গায়ে কোণের দিকে ওস্তাদজির দেয়া তানপুরোটা ঢাকনা গায়ে লম্বা হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে চুপ। ওস্তাদজিকে বড়ো দেখতে ইচ্ছে করলো। কিন্তু উপায় নেই। উঠে গিয়ে হাত বুলোলো তানপুরোটার গায়ে, ঢাকনা খুলে কোলে

নিয়ে ঝেড়ে পুছে আবার দাঁড় করিয়ে দিলো দেয়ালে। কতোকাল বাদে একটা গানের কলি উড়ে এসেছিলো গলার মধ্যে, দাঁতে দাঁত চেপে গিলে ফেললো সেটা।

নবীন ব'লে, গান গায় বেশ্যারা আর বাইজিরা। ভদ্রলোকের মেয়ের গলায় গান শুনলে তার বমি এসে যায়।

সন্তোষবাবু তৈরি হচ্ছিলেন মেয়েকে দিয়ে আনার জন্য। সুবোধ ট্যাকসি আনতে যাবার জন্য সাইকেল বার করছিলো। এই শহরে মাত্র দুটোই ট্যাকসি আছে। তা-ও মাত্রই দু'তিন বছর যাবত। ট্যাকসি আর কে চড়ে সব তো সাইকেল আর সাইকেল রিকশা। ট্যাকসি চড়তে ক'জনের মুরোদ আছে? নেহাৎই খুব দূরে কোথাও যেতে হ'লে বাধ্য হ'য়ে ডাকে। সন্তোষবাবুর বাড়ি থেকে তার জামাইয়ের বাড়ি ততোদূর নয়, যে দূরত্বে সাইকেল রিকশায় পার হওয়া চলে না। কিন্তু অত বড়োমানুষের স্ত্রীকে রিকশায় চড়াবার সাহস সন্তোষবাবুর নেই। নিজেদের গাড়ি চ'ড়ে মেয়ে জামাই জোড়ে আসবে, কতো সাধ ছিলো, তা তো আর হ'লো না।

ভাবতে ভাবতে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েই বুকটা কেঁপে উঠলো আনন্দে। কী ভাগ্য। জামাই এসে গেছে, মস্ত কালো গাড়িখানা পুষ্পক রথের মতো আস্তে এসে থেমেছে দরজায়। হুমড়ি খেয়ে প'ড়ে যেতে যেতে তিনি সিঁড়ি নামলেন। গাড়ি থেকে জামাই নয়, জামায়ের বাড়ির ঝি নামলো। 'কোতায় গো, আমাদের বৌ কোতায়।' তার পরনে শান্তিপুরী কুঁচোনো শাড়ি, হাতে তাগা, গলায় পদক। বয়স্ক, কিন্তু সবল। খাঁটি পশ্চিম বঙ্গীয় এই পরিচারিকাটি ও-বাড়িতে নতুন নিযুক্ত হয়েছে। বৌকে চোখে চোখে রাখাই তার কাজ।

বাড়িটা পর্দানসীন। মেয়েদের পুরুষের সামনে বেরুনো পছন্দ করে না নবীন। এ-জন্যেই সে সদর অন্দর পুরোপুরি ভাগ ক'রে নিয়েছে। অন্দর বলতে তো এতোকাল মা-ই ছিলেন। বোনও

ছিলো বিয়ের আগে পর্যন্ত। আসলে যখনি তার মনে হ'লো এবার সময় হয়েছে বিয়ে করার তখুনি, দেয়াল পড়লো অন্দরে। এটা বৌয়ের জন্য ব্যবস্থা।

নন্দিনী যে এককালে একা-একা বোর্ডিংয়ে থেকেছে, ইশকুলে কলেজে পড়াশুনো করেছে, পুরুষ ওস্তাদের কাছে গান শিখেছে, সেজন্য একটা কাঁটা আছে নবীনের মনে। স্ত্রীকে মধ্যে মধ্যে গঞ্জনাও দেয় তা নিয়ে। হয়তো বা ঈষৎ অবিশ্বাসও করে, তাই এই ঝি।

দামিনী দেমাক ক'রে গাড়ি ধ'রে দাঁড়িয়ে রইলো। চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গরীবের বাড়ঘর দেখতে লাগলো তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে। নন্দিনীর মা নিভাননি একেবারে হাতে-পায়ে ধ'রে ভিতরে এনে বসালেন, থালা ভ'রে খাবার দিলেন, হেসে গ'লে মন ভিজিয়ে কথা বলতে লাগলেন।

নন্দিনী মাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে ভুরু কুঁচকে বললো, 'তুমি ওরকম বাড়াবাড়ি করছো কেন?'

মা চোখ বড়ো ক'রে বললেন, 'করবো না তো কী করবো? একে কুটুম বাড়ির ঝি, তার কতো বড়লোক কুটুম। আহা, একদিন যদি জামাইকে আনতে পারতুম! আমার রাজা জামাই।'

এরপরে আর কী বলবার থাকতে পারে নন্দিনীর! সে চুপ ক'রে গেলো।

তারপর বিদায়ের পালা। মা ঠাকুমা দু'জনেই চোখ মুছতে লাগলেন। বাবার দিকে আর তাকানো গেলো না। দাদারাও নত মুখ।

এক বছর বাদে এই ক্ষণিক সুখ আরো দুঃখ ডেকে আনলো।

গাড়িতে আসতে আসতে দামিনী বললো, 'এই তোমার বাপের বাড়ি? এর মধ্যে এতোগুলো লোক থাকে কী ক'রে?'

নন্দিনী জানলার বাইরে থেকে দৃষ্টি একবার ভিতরে এনে ফিরিয়ে নিলো।

'ভাগ্য করেছিলে তাই রাজার ঘরে বিয়ে হয়েছে। কিন্তু ভাগ্যকেও ধরে রাখতে হয়।'

নন্দিনী অন্যমনস্ক।

'তা বাছা বৌ মানুষ, স্বামীর মত না নিয়ে ওরকম হট ক'রে আসা তোমার উচিত হয়নি।'

নন্দিনী এবারও কোনো জবাব দিলো না।

'কর্তা এসে তো আমাকেই বকাবকি করলেন শেষে?'

'কেন, তোমাকে কেন?'

'যে কাজের জন্য মাইনে খাই সে কাজ করতে পারিনি ব'লে। কিন্তু আমি কী ক'রে জানবো তুমি কখন চ'লে এসেছো।

'কী কাজের জন্য মাইনে খাও তুমি?'

'তোমাকে দেখেশুনে রাখা।'

'আমি কি শিশু?'

'শিশুর আবার ভয় কী? ভয় মেয়েমানুষের বয়েস, মেয়েমানুষের রূপ। চোখে-চোখে না রাখলে কোন আগুনে কোন ঘি গলবে তা কি কেউ জানে?'

'কী বললে?'

'মন মতি অস্থির হ'তে কতোক্ষণ?'

'কার?'

'তোমারই হ'তে পারে। কতো লোক ঢুকছে বাড়িতে কার কেমন চরিত্র কে বলবে।'

নন্দিনীর দাঁতে কাঁকর পড়লো। থেমে থেকে বললো, 'তুমি তা হ'লে সেজন্যই আছো?'

দামিনী হঠাৎ অপ্রস্তুত ভাবে হাসতে লাগলো। সে বুঝলো এই গোয়েন্দাগিরির কথাটা তার জানানো উচিত হয়নি। অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা ক'রে খুশি ক'রে বললো, 'তোমার মা মানুষটি বড়ো ভালো।'

এরপরে আর কী বলতে পারে নন্দিনী? বুকের ভিতরটা আরো ফাঁকা হ'য়ে গেলো। নিজেকে একটা কয়েদী ছাড়া আর কিছুই মনে হ'লো না।

২০

গাড়ী এসে ফটকে ঢুকলো। দামিনী নেমে তাড়াতাড়ি নন্দিনীকে আড়াল ক'রে ক'রে সাবধানে সদর থেকে অন্দরে নিয়ে এলো, অন্দরের লম্বা গলিপথ পেরিয়ে পাশাপাশি হেঁটে হেঁটে তাব আপন ঘরে পৌঁছে দিয়ে চ'লে গেলো।

ঘরে ঢুকে নন্দিনী দেখলো বিছানার উপর ব'ঘেব মতো থাবা গেড়ে ব'সে আছে নবীন। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে, ঘরটা অন্ধকাব, জানালা দিয়ে আকাশের আলোয় তবু ঝাপসা-ঝাপসা দেখা যাচ্ছে সব। নন্দিনী সেই আলোতেই তার স্বামীর ক্রুদ্ধ ভঙ্গিটি বুঝতে পেরে থমকে দাঁড়ালো। জানতে বাকী রইলো না ঝড় আসন্ন।

আলো না জ্বেলে অন্ধকারে ব'সে থাকাটাও একটা ক্রোধের লক্ষণ। আস্তে আস্তে কোণেব দিকে এগিয়ে গিয়ে সে স্যুইচটা টিপলো। বৈদ্যুতিক আলোর প্রভায় এবার দু'জন দু'জনকেই স্পষ্ট চেহারায় দেখতে পেয়ে তাকিয়ে রইলো খানিকক্ষণ। তারপরেই নবীন প্রায় ঝাঁপিয়ে প'ড়ে বললো, 'তুমি কার হুকুমে বাপের বাড়ি গিয়েছিলে?'

নন্দিনী জবাব দিলো না।

'বলছি, তুমি কার অনুমতি নিয়ে ঐ একটা পেটি সন্তোষ ডাক্তারের বাড়িতে চ'লে গিয়েছিলে?'

শক্তি সঞ্চয় করতে নন্দিনী চোখ বুজলো।

'আমার কথা কী তোমার কানে ঢুকছে না?'

'ঢুকছে।'

'তবে জবাব দিচ্ছ না কেন?'

'কী জবাব দেবো?'

'বলছি যে তুমি কার অনুমতি নিয়ে এ-বাড়ির দরজা পেরিয়েছিলে?'

'তোমার।'

'আমার?'

'হ্যাঁ।'

'আমি যখন বেরিয়ে যাই তখন তো তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করোনি কিছু।'

'দরকার হয়নি।'

'দরকার হয়নি! কেন দরকার হয় নি?'

'তুমি বলেছিলে তুমি যাবে না আমি যেতে পারি এবং এই সর্তে যে রাত্রিবাস করবো না।'

একটু থমকালো নবীন। পরমুহূর্তেই মেজাজের ছিলাটা সেখানেই টান রেখে বললো, 'কবে বলেছি?'

'বাবা যেবার প্রথম নিতে এলেন।'

'সে তো এক বছর আগের কথা।'

'আমার ধারণা ছিলো না তুমি মত বদলেছো।'

'হ্যাঁ, মত বদলেছি। আমি চাই না বাকি জীবন আর তুমি সেখানে যাও।

'কিন্তু আমি তাদের মেয়ে।'

'মেয়ে অবস্থায় যা করেছে করেছো, কিন্তু আমার স্ত্রী অবস্থায় আর আমি তোমার কোনো স্বেচ্ছাচারীতাকেই প্রশ্রয় দেবো না।'

'ও।'

'তোমার বাবাকেও আমি স্পষ্ট ক'রে ব'লে দিয়েছি সে কথা।'

'আমার বাবা ব'লো না, ওটা তোমার মুখে মানায় না। বলো সন্তোষ ডাক্তারকে।'

'বেশ তাই। তবু তিনি নিয়ে গেলেন কোন সাহসে?'

'তিনি নিতে চাননি।'

'তবে।'

'আমি তোমার মা এবং আমার বাবা দু'জনের মতের বিরুদ্ধেই জোর ক'রে গিয়েছিলাম।'

'অর্থাৎ দেখালে যে আমাকে না ব'লেও যাওয়া যায় ?'

'না।'

'নিশ্চয়ই।'

'তা হ'লে তাই।'

'তবে কেন গিয়েছিলে ?'

'আমার ইচ্ছে হয়েছিলো।'

'তোমার ইচ্ছে হয়েছিলো ?'

'এতোদিন ইচ্ছে হয়নি তাই যাইনি।'

'ও। তা হ'লে গাড়ি না পাঠালে তুমি আসতে না ?'

'আসতাম।'

'কেন ? এখানকার মতো ওখানে ঘি দুধ মিলতো না ব'লে ?'

'এখানেও আমি ঘি দুধ খাই না।'

'খাও না বুঝি ?'

নন্দিনী ঘর ছেড়ে চ'লে যেতে উদ্যত হ'লো। 'শোনো', নবীনের গলার পর্দাটা অনেকটা উঁচুতে উঠে গেলো।

ততোধিক নিচুতে নামিয়ে নন্দিনী বললো, 'কেন ?'

'আমার কথা না শুনে তুমি চ'লে যাচ্ছিলে কোন সাহসে ?'

'তুমি যা বলছিলে তা শোনার যোগ্য নয় বলে।'

'কী !'

'আমি যাই, আমার কাজ আছে, মা রান্নাঘরে একা একা পেরে ও ঠেন না।

'ও, সেই দুঃখে ফিরে এসেছ — '

'সেই দুঃখে না হ'লেও এ-বাড়িতে সেই একটি মানুষের জন্যই আমি টিঁকতে পারছি।'

'আর স্বামী ? সে কিছু নয় ?'

'সব সম্পর্কই পারস্পরিক। তোমার কাছে যদি আমি কিছু না পাই, তা হ'লে আমার কাছ থেকে তুমি আর কী আশা করতে পারো ?'

'বাপের বাড়ি গিয়ে একবেলার মধ্যেই আবার সেইরকম চ্যাটাং-

চ্যাটাং কথা শিখে এসেছো? এরপরে লোকটা আবার আসুক, যদি ঘাড় ধ'রে না তাড়াই — '

নন্দিনার চোখ লাল হ'য়ে উঠলো। দ্রুতপায়ে দরজার কাছে চ'লে এলো। খাট থেকে নেমে এসে নবীন পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে প্রবল চাপে হাত ঝাঁকিয়ে বললো, 'বাকী জীবনে আর কখনো আমি তোমাকে ওখানে যেতে দেবো না।'

নন্দিনীর মনে হচ্ছিলো হাতের হাড়গুলো ভেঙে চৌচির হ'য়ে যাচ্ছে। কিন্তু সে শব্দ করলো না।

'বুঝতে পেরেছো?' শেষ ঝাঁকানি দিয়ে নবীন ছেড়ে দিলো হাত, দরজার ছিটকিনিটা তুলে দিয়ে বললো, 'ব'সে থাকো ঘরে, এখন কোথাও তোমাকে যেতে হবে না।'

নন্দিনী দেয়ালে ঠেসান দিয়ে দাঁড়ালো।

'দাঁড়িয়েই থাকবে নাকি?' পাশের চেয়ারটায় গিয়ে বসলো নবীন, 'বলো, সারাদিন কার সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি ক'রে এলে।'

নন্দিনী জবাব দিলো না।

নবীন দাঁত কিড়মিড় করলো, 'তোমার এই চুপ ক'রে থাকাও আমি ঘুচিয়ে দেবো।'

তেমনিই দাঁড়িয়েই আছে নন্দিনী।

'তুমি একা গিয়েছিলে কেন?' চেয়ার ছেড়ে আবার উঠে এসে নবীন স্ত্রীর মুখোমুখি হ'লো।

'একা যাইনি।'

'নিশ্চয়ই একা গিয়েছো।'

'সন্তোষ ডাক্তার সঙ্গে ছিলেন।'

'দামিনীকে নাওনি কেন?'

'তোমার কাছে যিনি একটা লোক, আমার কাছে তিনি একজন পরমারাধ্য ব্যক্তি, তিনি আমার পিতা। তার সঙ্গে যেতে হ'লে কোনো প্রহরা দরকার হয় তা আমি জানতাম না।'

'তিনি কি তোমাকে সারাক্ষণ সঙ্গে ক'রে ছিলেন?'

'না, সারাক্ষণ আমাকে চোখে চোখে রাখেন নি, তবে ফেরবার পথে দামিনী না থাকলে বোধহয় ড্রাইভারের সঙ্গেই পালিয়ে যেতাম।'

'তোমাদের মতো মেয়ের পক্ষে তা-ও সম্ভব।'

'মেয়ে গোয়েন্দা লাগিয়ে কি কোনোদিন কেউ কাউকেই আটকাতে পারে ব'লে তোমার বিশ্বাস?'

'পেটের বাচ্চাটা আশাকরি আমার?'

'না হলেই সুখী হতাম।'

'কী বললে?' গর্জে উঠলো নবীন, রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললো, 'একটা ভদ্রলোকের মেয়ে হ'য়ে কী বললে তুমি?'

'মারবে নাকি?' নন্দিনীর গলা বরফের মতো ঠাণ্ডা।

'ছাল ছাড়িয়ে নেবো। কুলটা স্ত্রীলোক।'

'তাই নাও।'

'বেশ্যা।'

'আর?'

'ইচ্ছে করছে গলা ধাক্কা দিয়ে এখুনি বার ক'রে দিই বাড়ি থেকে।'

'দাও না।'

'তা হ'লে খুব সুবিধে হয়, না?'

'এর চেয়ে আর কী অসুবিধে হবে?'

'আবার মুখে মুখে কথা? আগেই জানি, যে মেয়ে, মেয়ে দেখতে গেলে পর পুরুষের মুখের দিকে তাকিয়ে লম্বা চওড়া ফুটুনি ঝাড়ে, তাদের প্রকৃতি কী।'

'জেনে শুনে কেন এই আপদ ঘাড়ে নিলে?'

'নিয়েছি শিক্ষা দিতে। যেমন কুকুর তেমন মুগুর কাকে বলে সে কথা ভালো ক'রে বুঝিয়ে দিতে।'

২১

সেই রাত্রে নন্দিনী শাশুড়ির কাছে গিয়ে শুলো। তার শরীর খারাপ লাগছিলো। শাশুড়ি বললেন, 'ষাট ষাট, এ অবস্থায় এতো অশান্তি সইতে পারে মানুষ?'

নন্দিনীর দেওর ভূপতি এসেছে বিকেলে। তরুণ যুবক, একুশ-বাইশ বছর বয়েস, দেখতে মায়ের মতো, স্বভাবেও মায়ের মতোই। দেওর ননদ দু'জনেই তাদের দাদা থেকে একেবারে ভিন্ন প্রকৃতির। এক এক বছরে এদের সঙ্গে তার সম্পর্ক যথেষ্ট গভীর হয়েছে। ননদকে অবশ্য সেই বিয়ের সময় একবার দেখেছিলো, আর দেখলো এই কয়েক মাস আগে পুজোর সময়। স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই এসেছিলো, নন্দাই চ'লে গেলেন দশমীর পরে, তাঁর আপিশ খুলে গেল, ননদ থাকলো। প্রায় একমাস ছিলো। দিনগুলো আলাপে আনন্দে বন্ধুতায় সহযোগিতায় এতো সুন্দর কাটলো।

বলা যায় প্রায় তারই বয়সী মেয়ে। দু'চার বছরের বড়ো। নবীন যখন চোদ্দো বছরের বালক, তখন আবার তার মা এই কন্যার জননী হন, আর এই কন্যার যখন আট বছর তখন জন্মালো ভূপতি। আর ভূপতির জন্মের অব্যবহিত পরেই মারা গেলেন তাদের বাবা।

এ-বাড়ীর রীতি অনুযায়ী বলাই বাহুল্য মেয়েকে ওঁরা লেখাপড়া শেখাননি, বড়ো হ'তে-হ'তে তার দাদা একেবারে অবরোধ প্রথা অবলম্বন করলে। বিয়ে দিতে অবশ্য যতো তাড়াতাড়ি ইচ্ছে ছিলো ততো তাড়াতাড়ি পারেনি, পাত্র পায়নি, আর নতুন ব্যবসা পত্তনের খাটুনিতে এবং নেশায় সময়ও পায়নি। তারপর হঠাৎ ষোলো বছরের যুবতী বোনের দিকে তাকিয়ে একদিন সে চকিত হ'লো আর তক্ষুণি প্রায় হাতের কাছে যাকে পেলো তার সঙ্গেই দিয়ে দিলো বিয়ে। ছেলেটি বড়লোক নয়, নেহাৎই মধ্যবিত্ত। চাকুরিও কেরাণীর, কিন্তু

ভাগ্যগুণে দৈব সহায় হ'লো ছেলেটি সুশিক্ষিত সহৃদয় সৎ এবং সজ্জন। স্ত্রীকে স্ত্রীর মর্যাদা দিতে জানে, নবীনের বোন সত্যিই সুখী হয়েছে।

ননদ চ'লে যাওয়ার পরে কয়েকটা দিন শাশুড়ি বৌ দু'জনেই খুব মন মরা হয়েছিলো। জীবন তো এই অন্দরমহলটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ, আর কিছুই নেই, তবু ঐ বাইরে থেকে আসা ঘরের মেয়েটিই যেন বেশ কিছু আলো হাওয়া নিয়ে ঢুকেছিলো। সে যেতেই আবার বন্ধ হ'য়ে গেলো।

ভূপতি থাকে বারো মাইল দূরে পেট্রল পাম্পের আপিশে। মাঝে-মাঝে আসে, সে এলেই আবাব একটু বেঁচে ওঠে নন্দিনী। আগে প্রত্যেক শনিবার আসতো, দাদা বকে। তাই সেটা বাদ গেছে, এখন মাসে একবার আসে। তা-ও মাত্র এক দু'দিনের জন্য। দাদা তা-ও চান না। তিনি বলেন, এসব কাজের গাফিলাতি আমি সহ্য কবতে পারি না। কেন, প্রত্যেক মাসে আসবাব কী দবকার? কী আছে এখানে। এসে তো কেবল মেয়েদের সঙ্গে আড্ডা।

ভূপতি বৌদিকে ভালবাসে, পছন্দ করে, শ্রদ্ধা করে। তাব বৌদি যে একজন অতি বিদুষী মেয়ে তা নিয়ে মনে খুব গর্ব। সে নিজেও লেখাপড়ায় ভালো ছিলো। পড়াশুনোয় উৎসাহ ছিলো, আগ্রহ ছিলো। কিন্তু ম্যাট্রিক পাস করার সঙ্গে সঙ্গেই দাদা কাজে ঢুকিয়ে দিলেন। প্রথম বিভাগে পাস ক'রে খুব ইচ্ছে হয়েছিলো শিলং কলেজে গিয়ে ভর্তি হবার। মার সঙ্গে একটু আবদারও করেছিলো, সঙ্গে সঙ্গে দাদাব রক্ত চক্ষুর দিকে তাকিয়ে ছিট্‌কে গিয়ে পেট্রল পাম্পে বসলো চুরি ধরতে। দাদাকে বাঘের মতো ভয় করে, ভক্তি করে না। বোধহয় ভালোও বাসেনা। দোকানে ব'সে ব'সে নিজেকে তার ছোটো মনে হয়, ব্যর্থ মনে হয়। দাদা কর্মবীর। এই বয়সে মাত্র এই কয়েক বছরে তাঁর দ্বারা যা সম্ভব হয়েছে তা আর কারো দ্বারা হ'তো কিনা সন্দেহ! তবুও দাদার জীবন তার পছন্দ নয়, নিজের জীবন যাপন

বিষয়ে তার ধারণা সম্পূর্ণই অন্য রকম। সে এমনো ভেবেছিলো লেখাপড়া শিখে সে মাষ্টার হবে, গরীব মাষ্টার। দাদার ধন রত্ন নিয়ে দাদা থাকবেন, সে তার কুঁড়ে ঘরে মাকে নিয়ে রানী ক'রে রাখবে, সেই কুড়ে ঘরই তার প্রাসাদ হবে। কিন্তু ভাবনা ভাবনাই। এক বছর বয়েস থেকে যে দাদা খাইয়ে পরিয়ে সোহাগে যত্নে (তার নিজস্বধরণে) মানুষ ক'রে তুলেছে তাকে অমান্য করা সহজ নয়।

কিন্তু এক বছর যাবত দাদা বিবাহিত হবার পরে স্ত্রীর প্রতি তার প্রভুত্বের ভীষণতা দেখে মাঝে মাঝে সত্যি বিদ্রোহ করতে ইচ্ছে করে। বৌদির পক্ষ নিয়ে চেঁচিয়ে ঝগড়া করতে ইচ্ছে করে কিন্তু আশৈশব এতো ভয় পেয়ে পেয়ে বড়ো হ'য়ে উঠেছে যে সে বিদ্রোহের ইচ্ছে নিরবেই উৎপন্ন হয়, নিরবেই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

বৌদিকে রাত্রিবেলা মার ঘরে দেখে সে খুশি হ'য়ে নিজের ঘর থেকে চ'লে এলো।

'এখনো শুতে যাওনি?' গল্প করার ভঙ্গিতে আসন পিঁড়ি হ'য়ে বসলো।

ম্লান মুখে হাসলো নন্দিনী। মা বললেন, 'আজ আমার কাছে শোবে।'

'কেন? হঠাৎ?'

'তোর দাদার কোন ইয়ে আছে নাকি? বিকেলে কী কাণ্ড করলো, শুনলি না?'

'ও।'

'এই অবস্থা, এতো শরীর খারাপ —'

'তুমি এলে কেন? কেন ক'দিন থেকে এলে না? দয়া ক'রে তো এক বছর বাদে যেতে দিলেন বৌকে —' অসন্তোষে ফেটে পড়লো সে।

মা বললেন, 'যেতে দিলো কোথায়? ওতো না-ই করেছিলো, আমিও জানতাম এ-রকমই একটা বিশ্রি রাগারাগি করবে, সত্যি না গেলেই হ'তো।'

'এটা তুমি কী বলছো মা? বিয়ে হয়েছে ব'লে কি নিজের মা বাপকে ত্যাগ করতে হবে। যেতে ইচ্ছে করে না? দাদার কোন হৃদয় নেই, দাদা একটা রোবোট।'

'চুপ চুপ।' মা ভয়ে ভয়ে চারদিকে তাকালেন। বললেন, 'যা যা, শুয়ে পড়গে, আর কথা নয়, আলো নয়, সাড়ে ন'টা বেজে গেছে।' টুক ক'রে বাতি নিবিয়ে দিলেন তিনি।

কিন্তু রোবোটের ঘরের বাতি কিন্তু নিয়মের ব্যতিক্রম ক'রে দশটা বেজে গেলেও নিবলো না। সে ব'সে রইলো চুপ ক'রে। আশা করতে লাগলো স্ত্রী আসবে।

এগারোটার সময় ডাকতে এলো দামিনী, 'ও মা, ঘুমুলেন নাকি? বৌদিকে যে খুঁজছেন দাদাবাবু।'

মা ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন। পাশে শায়িত বৌয়ের গায়ে হাত দিয়ে বললেন, 'বৌমা, তুমি ব'লে আসোনি যে এখানে শোবে?'

শুয়ে থেকেই নন্দিনী বললো, 'না।'

'তবে?'

'তবে কী?'

'এখানে শোবে কেন?'

'এখানে শুলে কী হয়?'

'না না।'

নন্দিনী উঠলো না।

'লক্ষ্মী মা যাও, আবার রাত ক'রে হাঙামা করবে।' শাশুড়ি মাথায় হাত বুলোলেন।

'আমি আপনার কাছেই শোবো।' নন্দিনী জেদ করলো।

শাশুড়ি হাতে ধ'রে তুলে দিতে দিতে বললেন, 'তা শোও। কিন্তু শুনে এসো কেন ডাকছে।'

এবার নিঃশ্বাস ফেলে উঠতেই হ'লো তাকে। লোক লজ্জা কাটাতে সময় লাগছে তার, নইলে একটা হেস্ত-নেস্ত হ'য়ে

গেলে মন্দ হ'তো না। তাছাড়া শাশুড়িকে বিব্রত করতেও ইচ্ছে করে না।

ঘরে এসে বললো, 'ডেকেছ কেন?'

গম্ভীর ভাবে নবীন বললো, 'শোবার জন্য।'

'স্ত্রীর সঙ্গে তোমার শোয়াটাই যদি আসল উদ্দেশ্য হয় তা হ'লে সে ইচ্ছে আমি পূরণ করতে পারবো না।'

'আমার সব ইচ্ছা পূরণেরই দাসী তুমি।'

'কেন?'

'তোমাকে আমি বিয়ে করেছি।'

'বিয়ে করলেই কেনা হ'য়ে যায় না।'

'যায় কি যায় না দেখবে?'

'তুমি আমাকে যা খুশি তা করতে পারো, কিন্তু আমি —'

নবীন সহ্যের সীমান্তে পৌঁছে গেলো। নন্দিনীর কথা শেষ হ'লো না, উঠে এসে জাপটে ধরলো, আলো জ্বলতে থাকলো, দরজা আধ-ভেজানো রইলো, সেই অবস্থাতেই চিত ক'রে ফেলে দিল মাটিতে, একটা উন্মাদের মতো কাম চরিতার্থ করতে করতে বললো, 'এবার? এবার বল্ আর কোন পুরুষের এই অধিকার আছে তোর উপরে? আর কোন পুরুষের বাচ্চা তুই ধারণ করতে পারিস তোর পেটে।'

কথাটা মিথ্যে নয়। আর কোনো পুরুষ এই অত্যাচার করলে সে চিৎকার করতে পারতো, সে বাঁচতে পারতো। কিন্তু এই পুরুষ তার স্বামী। তার অধিকার কে খণ্ডন করবে? এক পক্ষের ইচ্ছায় হ'লেও তাকে ধর্ষণ বলে না। নৈলে বাড়িতে তো লোকজন আছে, একবার 'বাঁচাও' ব'লে আর্তনাদ ক'রে উঠলে তো সবাই এসে হাজির হ'তে পারতো, লাঠি শোটা দিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেলতে পারতো লোকটাকে। কিন্তু তা হবার নয়, এর হাত থেকে বাঁচবার আর কোনো উপায় নেই তার।

এক সময়ে সে অজ্ঞান হ'য়ে গেলো।

পরের দিনও বিছানা ছাড়তে পারলো না। আর তার পরের দিন ব্যথা উঠে নষ্ট হ'য়ে গেলো বাচ্চাটা।

২২

বলা যায় প্রায় মরতেই বসেছিলো। অনেক রক্ত গেলো শরীর থেকে, অনেক রক্ত দিতে হ'লো। বড়ো শহর থেকে লেডি ডাক্তার এলো কয়েকবার, অনেক দিন পর্যন্ত ওষুধে পথ্যে থাকতে হ'লো। নার্স রইলো দিন রাত্রির জন্য, মাসাবধি এতো দুর্বল রইলো যে পাশ ফিরতেও কষ্ট। নবীনের টাকা খরচ হ'লো অনেক, অনেক ঢাক-ঢোল পিটিয়ে খরচ করতে তার ভালোই লাগলো। তারপর আস্তে আস্তে আবার সুস্থ হ'য়ে উঠে বসলো কিন্তু মৃত্যুর বাসনায় পাগল পাগল করতে লাগলো মনটা।

আত্মহত্যা না করলে মৃত্যু মানুষের ইচ্ছাধীন নয়, আর আত্মহত্যা করার কথা মাথায় এলো না। তা হলে? তা হ'লে আর কী, আবার ফিরে এলো সেই জীবন। সেই দিন আর সেই রাত। দিন কাটে বলেই কাটতে লাগলো। বাইশ বছর বয়সে বিয়ে হ'য়েছিলো কখন যে গড়িয়ে গড়িয়ে আরো প্রায় তিনটা বছর কেটে গেলো কে জানে।

এরি মধ্যে একবার এসে ভূপতি বললো, 'খবর জানো বৌদি?'

'কী?'

'তোমার সেই ওস্তাদ মামুদখান —'

'হ্যাঁ।'

'তিনি বোধহয় মারা যাচ্ছেন।'

'সে কী!'

'তোমার দাদার সঙ্গে আমার বাজারে দেখা হ'য়েছিলো, উনিই বললেন।'

'কী হয়েছে।' ম'রে যাওয়া মনের শুকিয়ে যাওয়া শিরা উপশিরা হঠাৎ সজোরে ঝাঁকি খেয়ে চনমন ক'রে উঠলো।

'সুবোধবাবু বললেন, নিউমোনিয়া।'

'নিউমোনিয়া!'

'বয়েস হ'য়েছে তো, নিউমোনিয়া হ'লে কি আর রক্ষে আছে।'

'আর চিকিৎসা?'

'তা তো জানিনে। এই পচা শহরে চিকিৎসার সুযোগই বা কোথায়?'

'তা হ'লে কী হবে?'

'তোমাকে নাকি দেখতে চেয়েছেন।'

'আমাকে?'

'সুবোধবাবু বললেন, হয়তো এই তাঁর শেষ বাসনা।'

'দাদা গিয়েছিলেন?'

'বোধহয়। নয়তো জানলেন কী ক'রে?'

'ঠাকুরপো —'

'বলো।'

'আমাকে একবার নিয়ে যাবে?' নন্দিনী ঠাণ্ডা হ'য়ে আসা কম্পিত হাতে ভূপতির হাত জড়িয়ে ধরলো।

ভূপতি চিন্তিত হ'য়ে বললো, 'কিন্তু দাদা কি মত দেবে?'

'আমি হাতে পায়ে ধ'রে রাজি করাবো।'

'তা-ও যদি রাজি না হয়?'

'কী আশ্চর্য! আমি আমার একজন অসুস্থ আত্মীয়কে দেখতে যাবো, এতে তার রাজি না হবার কী আছে?'

'তুমি তো সবই জানো বৌদি, সবই তো মেনে নিয়েছ।'

'কিন্তু তারও তো সীমা আছে?'

'সেই সীমা তো মনে হয় তুমি পেরিয়ে গেছ।' ভূপতি হাসলো।

নন্দিনী বললো, 'ভেবেছিলাম তাই। মনকে আমি আমার ভাগ্যের স্রোতেই ভাসিয়ে রেখেছিলাম, কিন্তু আসলে মানুষ তা পারে না। যদি সে মত না দেয় তবুও আমি যাবো!'

'তারপর?'

'তারপর যা হয় হবে।'

'তবু একবার জিজ্ঞেস ক'রে ছাখো।'

'তা করবো, কিন্তু তুমি নিয়ে যাবে তো?'

'আমার ভয় করে। দিনের দিন তো দাদা আরো কেমন হ'য়ে উঠছেন। সেদিন আমাকে কী যাচ্ছেতাই করলেন গিয়ে।'

'কোথায়?'

'পেট্রল পাম্পে আর কোথায়?'

'কেন?'

'হিশেব মেলাতে পারছিলাম না। বৌদি, আমার আর ভালো লাগে না এই কাজ। ব্যবসা-বাণিজ্য সত্যি আমি পারি না।'

'করো কেন?

'না ক'বে কী করবো?'

'বাড়ি ছেড়ে নিরুদ্দেশ হ'য়ে যাও।'

'ঈশ! কী কুপরামর্শ। দাঁড়াও বলে দিচ্ছি দাদাকে।' ঠাট্টা ঠাট্টা ভাব ক'রে বললো বটে, তারপরেই ম্লান হ'য়ে বললো, 'আমিও কিন্তু মাঝে মাঝেই একথা ভাবি। কিন্তু আমার পিছুটান আমার মা। মাকে কষ্ট দিয়ে লাভ কী? বরং তুমিই একদিন নিরুদ্দেশ হ'য়ে যাও। লেখাপড়া শিখেছো, তোমার ভয় কী? আমি তো হস্তী মূর্খ, মাটি কাটা ছাড়া আর তো কিছু হবে না?'

'মন্দ বলোনি। যাবো নাকি একদিন নিরুদ্দেশ হ'য়ে?'

'যাবার আগে আমাকে ঠিকানাটা দিয়ে যেয়ো, তৎক্ষণাৎ আমিও নিরুদ্দেশ হবো।'

'খুব ভালো।'

এরপরে রান্নাঘরে জলখাবার ঠিক করতে করতে নন্দিনী উঠে এ-ঘরে এলো।

কাজ থেকে ফিরে নবীন হুস হুস ক'রে এক ড্রাম জলে স্নান করছিলো, তোয়ালে জড়িয়ে এবার বেরিয়ে এলো। নন্দিনী তাড়াতাড়ি হাতের কাছে এগিয়ে দিলো লুঙ্গিটা। যা গরম, এই সময়ে সে লুঙ্গি প'রে খালি গায়ে থাকে। সারা গায়ে পাউডার ছড়িয়ে মাথা আঁচড়ে প্রস্তুত হ'তে-হ'তে দৌড়ে গিয়ে চা জলখাবার নিয়ে এলো। সদ্য ভাজা কচুরি, ঘরে ছানা কেটে মার তৈরি বড়ো বড়ো কাঁচাগোল্লা, খানিকটা পেস্তা বাদাম কিসমিস, আর তিনটি মর্তমান কলা।

নবীন প্রসন্ন দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললো, 'এবার আমার কাঠের ব্যবসায় কতো লাভ হয়েছে জানো?'

নন্দিনী অন্যমনস্কভাবে বললো, 'আমি বলছিলাম যে —'

'কী চাও বলো?' নবীন আজ দরাজ হাত।

'বলছিলাম —'

'বলো।'

'আমার ওস্তাদ আলমামুদের খুব অসুখ, একবার দেখতে যেতে চাই।'

'কার?'

'আমাকে গান শেখাতেন, আমার বাবার চেয়েও আমি তাঁকে বেশি ভালোবাসি, ভক্তি করি। তিনি আমার গুরু।'

'ও সেই দেড়েল মোছলমানটা?'

নন্দিনী চমকালো।

'জানি জানি, কী সব কাণ্ড ক'রে পাহাড়ে এসে লুকিয়েছে।'

'ছি।'

'হিন্দু মেয়ে ফুশলানোই তো ওর পেশা। তোমার সঙ্গেই যেন কম কীর্তি কাণ্ড করেছে।'

'এসব কী বলছো তুমি?'

'ভেবোনা লুকিয়ে-লুকিয়ে জল খাও আর একাদশীর বাপেও জানতে পারবে না।'

নন্দিনী হতবাক হ'য়ে তাকিয়ে রইলো।

নবীন বললো, 'বুকে হাত দিয়ে বলো তো, সময়ে-অসময়ে পালিয়ে তুমি যাওনি বদমাসটার ঘরে?'

'ছি ছি ছি।'

'ছি ছি ছি', মুখে মুখে ভ্যাঙালো নবীন, 'পাশাপাশি শহর বলতে গেলে দুই পাড়া, সারারাজ্যি আমি ঘুরে বেড়াই, আমার চোখে ধুলো দেয়া খুব কঠিন বুঝলে? তোমাব বাবার মতো বহু মেয়ের বাপ তো ধর্ণা দিয়েছে এসে এই পায়ে, এই চৌহদ্দির সব ক'টা মেয়েকে আমি চিনি। তোমাকে ও পাহাড় ডিঙোতে দেখেছি —'

'তা হ'লে তুমি যেতে মত দিচ্ছ না?'

'কোনো প্রশ্নই ওঠে না।'

'ঠিক আছে।'

'তুমি যে এ রকম একটা আজগুবী প্রস্তাব করতে সাহস পেলে, সেটা ভেবেই আমি অবাক হ'য়ে যাচ্ছি।'

'তাই তো।'

'তোমার পক্ষে সবই সম্ভব।'

'বোধহয়।'

'দাও, মশলা দাও।' নবীন খাওয়া শেষ করলো। নন্দিনী বাসন কুড়িয়ে নিয়ে চ'লে গেলো। তারপর বারান্দায় গিয়ে ব'সে রইলো চুপ-চাপ।

পরের দিন সকালে নবীন কাজে বেরিয়ে গেলে, সে-ও বেরুলো। এতো একটা প্রকাণ্ড বাড়ি, মানুষ মাত্র দু'জন। সে আর তার শাশুড়ি। শাশুড়ি থাকেন শাশুড়ির দিকে সে থাকে তার দিকে। মাঝখানে লম্বা গলি। দামিনীও আছে, বৌদির আশে-পাশে থাকাই যদিও তার কাজ কিন্তু সেই কর্তব্য পালন করার প্রয়োজন হয় না

ব'লে সে-ও এপাশে-ওপাশে ঘুরে বেড়ায়। অন্যান্য পরিচারক পরিচারিকাদের সঙ্গে ওস্তাদি করে। কে যে কখন কোন ঘরে কী করছে এই তিনটি মানুষের মধ্যে জানাই যায় না। নবীন বেরিয়ে গেলেই সুমসাম চুপচাপ বাড়ি। ফিরে এলে আবার কোলাহল।

অন্যান্য দিন নবীন বেরিয়ে গেলে, তারপর তারা শাশুড়ি বৌ প্রাতঃরাশ সমাপ্ত করে। প্রাতঃরাশের পরে কী রান্না হবে, কী বাজার আসবে, মশলা কী কী বাটা হবে, কী তরকারি কোটা হবে এসব ব্যবস্থাপনায় এতো ব্যস্ত হয়ে পড়েন শাশুড়ি যে আর কোনো দিকে তাঁর মন দেবার সময় থাকে না। তারপর আছে ভাঁড়ার বের করা, চাল ডাল তেল নুন — লোকজন তো কম নয়। এই হিশেবেও হিম সিম খান। সেই সময়ে নন্দিনী ঘরে চ'লে আসে, নবীনের তচ্‌নচ্‌ ক'রে যাওয়া ঘরটা গুছোয়। সারাবাড়ি ঝাড় পোছ করায়, কাপড় চোপড় কাচায়, আজ সে সব কিছুই হ'লো না, সকালের জলখাবারের পাট সাঙ্গ হতেই সকলের চোখ এড়িয়ে সে খিড়কির দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো।

সরু রাস্তাটা বেয়ে একটু এলেই একটা মস্ত পুকুর, হিজলের ডালে ডালে ছাওয়া, এতো কচুরি পানার ভিড় যে মনে হয় গালিচা পাতা সবুজ চত্বর। জায়গাটা অসম্ভব নির্জন, ডাহুক ডাকে, ঘুঘু ডাকে, শালিখ চড়ুই ঝগড়া করে, টিপি টিপি পায়ে বক মাছ ধরার চেষ্টায় নিমগ্ন থাকে, মনে হয়, এ এক অন্য রাজত্ব। সেই পাড় ধ'রে বিপথে হাঁটতে ভালো লাগছিলো নন্দিনীর। বাড়ির ছাদে উঠে এই মস্ত মজা পুকুরটা সে অনেক দিন তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছে, ঘুঘুর ডাকে ডাহুকের ডাকে স্মৃতির পাথারে ভেসে গেছে, কিন্তু ঠিক তার তীরে এসে দাঁড়ানো এই প্রথম। এবং এর অনুভূতি সম্পূর্ণ অন্য রকম। জলের গন্ধে, গাছের গন্ধে, বুনো ফুলের সুবাসে ম ম করছিলো বাতাস।

এর পরেই একটা জঙ্গল। নিবিড় না হ'লেও মন্দ ঘন নয়। লুকিয়ে থকেতে চাইলে পারা যায়। জঙ্গলটা পেরুলেই দক্ষিণের পথে বড়ো রাস্তা। আসলে যথেষ্ট ঘুর পথ। সদর দিয়ে বেরুলে বলা যায়

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই রিক্‌শা স্ট্যাণ্ডে এসে পৌঁছুনো যায়। কিন্তু নন্দিনী আর কী ক'রে সদর দিয়ে বেরুবে?

স্বামীর বাড়ি থেকে একা-একা পথে পা দেয়া তার এই প্রথম। বুকটা ঢিপ ঢিপ করছিলো। কিন্তু জঙ্গলটা ছাড়াতেই একটা রিক্‌শা পেয়ে গেলো, স্ট্যাণ্ড পর্যন্ত আর হাঁটতে হ'লো না লোকালয়ের সম্মুখীনও হ'তে হ'লো না। স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে উঠে বসলো তাড়াতাড়ি, সামনের ঢাকনাটা ফেলে দিলো।

পথ কম নয়, অন্তত মাইল দুয়েক তো হবেই। কেবল মনে হচ্ছে আর বুঝি দেখা হ'লো না।

কিন্তু হ'লো। সাইকেল রিক্‌শা তাকে ঠিক জায়গায় নামিয়ে দিয়ে পয়সা নিয়ে চ'লে গেলো। নন্দিনী পাথর ডিঙিয়ে কতোদিন পরে তার পরিচিত কুটিরের দরজায় এসে মুখ বাড়িয়ে কম্পিত কণ্ঠে ডাকলো, 'ওস্তাদজি।'

'কে!' ভিতর থেকে ওস্তাদজির চকিত গলা ভেসে এলো দরজায়।

নন্দিনী বললো 'আমি।' পায়ে-পায়ে ঘরের মধ্যে চ'লে এলো সে। মামুদ সাহেব কপালে হাত রেখে শুয়েছিলেন চুপচাপ, 'তুমি, তুমি এসেছো?' তাড়াতাড়ি উঠে বসলেন। খুশিতে ভরে গেলো মুখ, চোখ জলে ভ'রে গেলো। প্রণাম করতেই মাথায় হাত রাখলেন, 'কেমন আছো মা?'

দেখা গেলো ভূপতির মুখে শুনে ওস্তাদজিকে যতোটা অসুস্থ ভেবেছিলো, ততটা তিনি নন। তবে গায়ে জ্বর আছে বেশ।

'আপনি কেমন আছেন?' সে মেঝেতে বসতে যাচ্ছিলো, ওস্তাদজি হাতে ধ'রে পাশে বসালেন, 'শরীরটা বড্ড খারাপ যাচ্ছে ক'দিন।'

'আমি আপনার অসুখ শুনেই ছুটে এলাম।'

'গিয়েছিলে বুঝি সন্তোষের ওখানে? ওরা বলেছে?'

'না, আমার দেওর বললো, দাদার সঙ্গে বাজারে দেখা হয়েছিলো —!'

'ও। উমনিটার কাণ্ড ছাখো না, সেদিন হঠাৎ খেয়ে জ্বর এলো, আর মেয়ে কেঁদে কেটে খুন, 'বাবা তোমার কী হলো।' আরে জ্বর হলেই কি মানুষ ম'রে যায় নাকি? তা কি শোনে, গিয়ে তোমাদের বাড়িতে খবর দিয়ে এলো।'

'ঠাণ্ডা লাগিয়েছিলেন বুঝি খুব?'

'আরে না না — তোমার খবর বলো, গান-টান রেওয়াজ করো তো?'

'না।'

'কেন? ঐ তোমাদের দোষ। বিয়ে হলেই মনে করো সব কাজ সাঙ্গ হ'য়ে গেলো। নিজের প্রতিভা কি কেউ নষ্ট করে?'

নন্দিনী জবাব দিলো না।

'আমি তো প্রায়ই ভাবি এই বুঝি আমার মাতাজি এলো। এতোদিন কেন আসোনি মা? আমার বড় দেখতে ইচ্ছে করতো তোমাকে। যেদিন খুব শরীরটা খারাপ হ'য়ে পড়লো, সন্তোষকে বললাম, একবার নিয়েসো মেয়েকে, দেখি। সে এখন রাজরাণী হয়েছে, কতো সুখে আছে — '

নন্দিনী জবাব দিলো না।

'মাগো, জামাই গান ভালোবাসেন তো?'

'না।'

'এঃ, এটা বড়ো দুঃখের কথা তো। ঘরে অমন গানের পাখি নিয়ে গেলো — '

'ওস্তাদজি।'

'মা।'

'ডাক্তার দেখিয়েছেন?'

'তোমার বাবাই তো আছে মা, খুব ওষুধ খাচ্ছি, এখন ক'মে গেছে।'

'বাবা রোজ আসেন?'

'বাবা আসেন, সুবোধ আসে — তবে সকলেরই তো কাজ আছে, কে আর কতোক্ষণ ব'সে থাকতে পারে?'

'আমি থাকবো।'

'কোথায়?'

'এখানে। আপনি যতোদিন না সুস্থ হন, আমি সেবা করবো আপনার।'

'কথা শোনো মেয়ের, পাগলী —' ওস্তাদজি হাসতে হাসতে অস্থির।

'কেন, পাগলী কেন? মেয়ে কি বাপের সেবা করে না? শিষ্য কি গুরুর সেবা করে না?'

'তুমি কি এখন স্বাধীন মাতাজি! জামাই তা দেবেন কেন?'

'আপনার চেয়ে বেশি ভক্তি আমি কাউকেই করি না, আপনার কাজ আমার সকলের উপরে।'

নন্দিনী উঠে ক্ষিপ্র হাতে ঘর গুছোতে লাগলো। বিছানা টান ক'রে দিলো, ওষুধ পথ্য দেখে শুনে ঠিক ক'রে রাখলো, পায়ের তলায় ব'সে বললো, 'একটা গান করি ওস্তাদজি, একটু ভগবানকে ডাকি।'

২৩

পাহাড়ি মেয়েটি জল নিয়ে ঘরে এসে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো, নন্দিনীকে দেখে। এক নিঃশ্বাসে সে এক বছরের ইতিহাস শুনিয়ে দিলো। ফকির সাহেব যে কতো অনাচার করেন শরীরের উপর, অল্প-অল্প জ্বর হবার পরেও যে স্নান করেছেন, বাইরে ব'সে ঠাণ্ডা লাগিয়েছেন, গলা ব্যথা তবু গরম জল খাননি, সময় মতো খাওয়া-দাওয়া করেননি, সব কথাই বলা হ'য়ে গেলো তার। তারপর সে সাবু জ্বাল দিতে বসলো।

'তুমি ভালো আছো উমনি?' নন্দিনী কাঁধে হাত তার রাখলো।

উমনির ফর্সা গাল সুখে লাল, 'হামি তো বহিন একদম ভালো আছি, লেকিন বাবা ভালো না থাকলে আর ভালো লাগে না।'

সে তো ঠিক কথাই। তবে তুমি ভালো থাকলে বাবারও ভালো। তুমি ছাড়া বাবার আর কে আছে। কে দেখবে। সরো, আজকের পথ্য আমি তৈরি করি।'

'না বহিন না, সো বি হোয় না, আজ এখন আমি তোমাকে চা দিবো — সুজি করে দিবো।'

'কিছু কবতে হবে না তোমাকে। এখন বলো সকালে ওস্তাদজি কী খেয়েছেন।'

'শুধু এক কাপ চা, এখন সাবু দুধ দিবো — '

'আব দুপুবে?'

'দুপুরে ডাগদার বাবু ভাত পথ্য দিয়েছেন।'

নন্দিনী খোঁজাখুজি ক'রে ঠিক ক'রে নিলো সব। নরম ক'বে ভাত করলো, শুক্তো করলো, ছোটো ছোটো কী মাছ নিয়ে এসেছে উমনি, পাৎলা ক'রে ঝোল রাঁধলো। ওস্তাদজি কতো বারণ করলেন কিছুই শুনলো না। কতোকাল পরে কী যে ভালো লাগছিলো তার, তা কি সে কাবোকে বোঝাতে পারে?

একটা জীবনেব আস্বাদে ভ'বে গেলো মন।

আস্তে আস্তে বেলা বেড়ে উঠলো, রোদ চড়লো, যাবার নাম নেই নন্দিনীর। ওস্তাদজি ব্যস্ত হ'য়ে বললেন, 'এবারে যাও মা।'

'বললাম তো আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ না হ'য়ে ওঠা পর্যন্ত যাবো না।'

'সে কী হয়?'

'কেন হয় না?'

'না না, জামাই রাগ করবেন। আমি শুনেছি জামাই এসব ভালোবাসেন না।'

'কী সব?'

'সন্তোষ আমাকে বলেছে কিছু কিছু — '

নন্দিনী দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো।

'হাজার হোক, রাজার ঘরণী তুমি, সে যদি কিছু মেজাজ করে,

তাতো মাতাজী সইতেই হবে। পয়সার যে বড়ো গরম। তুমি যাও, বাড়ি যাও, আবার এসো, একদিন জামাইকে নিয়ে এসো —'

'আমি আপনার কাছে দীক্ষা নিয়েছি, আপনি আমার গুরু, এটা আমার আশ্রম, আমি আর ফিরে যাবো না।' নন্দিনীর গলা প্রত্যয়ে দৃঢ়।

এবার ওস্তাদজি একটা বিপদের আশঙ্কায় অস্থির বোধ করতে লাগলেন। তিনি উপলব্ধি করলেন এই মেয়ের হৃদয়ে বেদনার অন্ত নেই এবং এই অবস্থানে তা বাড়বে বই কমবে না। হাত ধ'রে অনুরোধ করলেন, 'আমার কথা রাখো, তুমি এখন যাও, উমনি তোমাকে রিক্‌শায় তুলে দিয়ে আসুক।'

এরপরে আর অবাধ্যতা করলো না নন্দিনী। বাড়ি ফিরে এলো।

শাশুড়ি একেবারে পাগলের মতো ছুটোছুটি করছিলেন, মাইনে করা দামিনীরও কম চিন্তা হয়নি, দাদাবাবু এলে কৈফিয়ৎ দেবে কী? শেষে চাকরি নিয়ে টানাটানি হবে।

অবশ্য বেশিক্ষণ যাবত খোঁজ পড়েনি, কাজকর্ম সেরে রান্নাঘর থেকে সব বেশিক্ষণ আগে শাশুড়ি ঘরে আসেননি। এসেও অনেকক্ষণ খেয়াল হয়নি, তবে বারে বারেই মনে হয়েছে আজ কেন তার পায়ে পায়ে চলা বৌমাটির দেখা নেই। কী হ'লো? আবার কি শরীর খারাপ হ'লো? তখনই তিনি গাল-গল্পে মত্ত দামিনীকে ডেকে বললেন, 'বৌমা কী করছে একা-একা ঘরে ব'সে? অনেকক্ষণ দেখছি না।'

তারপরেই কোথায় গেলো কোথায় গেলো রব উঠেছে। রব উঠতে উঠতেই পৌঁছে গেলো নন্দিনী।

ব্যাকুল হ'য়ে শাশুড়ি বললেন, 'কোথায় গিয়েছিলে?' নন্দিনী বললো, 'একজনের খুব অসুখ দেখতে গিয়েছিলাম।'

'কার অসুখ? কাকে দেখতে গিয়েছিলে? আগে তো বলোনি কিছু।'

'মাত্র কালই ঠাকুরপো বললো —'

'ভূপু ?'

'আমি একজনের কাছে গান শিখতাম, তিনি একজন ফকির আমার কাছে ঈশ্বরের মতো — '

'গান শিখতে ? গান জানো তুমি ?'

'সামান্য।'

'বলোনি তো।'

'কাকে বলবো ?'

'তা ও তো বটে। এ বাড়িতে আর কে তার সমাদর করবে, শুনবে বা কে। কিন্তু না বলে কেন গিয়েছিলে! আমি চিন্তা করছিলাম।'

'চিন্তা কী ? এতোবড়ো মেয়ে আমি — '

'নবীন জানে ?'

'না।'

'তবে ?'

'খুব অসুখ যে।'

'কিন্তু নবুকে না ব'লে গেছে শুনলে সে না অনর্থ করে।'

'কাল জিজ্ঞেস করেছিলাম — '

'কী বললো ?'

'যা বলা উচিত নয় — '

'এটা তুমি ঠিক করোনি বৌমা।'

'আমাকে উনি দেখতে চেয়েছিলেন, নিজের মেয়ের মতো ভালো-বাসেন।'

'তা হ'লেও একা একা —

'কাল ঠাকুরপোকেই নিয়ে যেতে বলেছিলাম, দাদার ভয়ে সে রাজি হয়নি। আর আজ তো সকালে চলেই গেলো।'

'নবুর অমতে কিছু তোমার করা উচিত নয়। জানোই তো রেগে গেলে তার জ্ঞান থাকে না।'

'একজন মানুষ কি সব সময়েই অন্যের ছায়া হ'য়ে চলতে পারে মা ?'

'কী করবে বলো? যেমন কপাল করেছো। মেয়ে মানুষকে সব পারতে হয়।'

'আমি আর পারি না।'

'শুনতে পাওনা আমাদের গোয়ালাটা সব সময় জরু আব গোরু একাঙ্গে বলে?'

হঠাৎ মিষ্টি ক'রে হাসলো নন্দিনী। তারপর শাশুড়ির হাত ধ'বে বললো, 'গোরুগুলো তবু যতো বোকাই হোক, ক্ষেপে গেলে ঠিক গুঁতোতে পাবে, জোরুগুলো শুধুই জাবব কাটে আর মাব খায় প'ড়ে প'ড়ে।

এরপরে শাশুড়িও হঠাৎ বৌকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধ'রে বললেন, 'তা ঠিক।'

ব্যাপারটা মিটে যেতো সেখানেই কিন্তু দামিনী কোটনামি করলো। চোখ বড়ো বড়ো ক'বে চুকলি কাটলো দাদাবাবুর কাছে এবং তাই নিয়ে যে হুলুস্থুলটা হ'লো তার দাপটে — সারাবাড়ি থর থর করতে লাগলো। স্বামীব সমস্ত অত্যাচার লাঞ্ছনা কটূক্তি নিঃশব্দে সহ্য করলো নন্দিনী। অবশ্য এটাই তার ধরণ। কিন্তু তাবপরের দিনও সে দামিনীর চোখে ধুলো দিয়ে বেরিয়ে গেলো। তাব অন্তঃকরণে আর যেন ভয় ডর ব'লে কিছু ছিলো না। যা হচ্ছে হোক, যা হয হোক, এক ফোঁটা শান্তির জন্যই এখন সে লালায়িত। এবং সেই শান্তি তাব পিত্রালয়ে নেই, আছে ঐ কুটিবে যেখানে সেই সাধু লোকটি সুরের বন্ধনে বেঁধেছে ভগবানকে।

সেদিন গিয়ে আর থাকলো না বেশিক্ষণ, ফিরে এলো আবার। শাশুড়ি দুঃখিত হ'য়ে বললেন, 'অত কাণ্ডের পরে তুমি আজ আবার গিয়েছো?'

'না গিয়ে পারিনি। অবিশ্রান্ত কোনো অন্যায়কেই আর আমি প্রশ্রয় দিতে পারছি না।'

'প্রশ্রয় কী? উপায় নেই যেখানে—'

'আমি যেতাম না, যেতেই হ'লো। ঐ অন্যায়ের প্রতিবাদ হিশেবেই যেতে হ'লো।'

শাশুড়ি ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, 'না মা না, আর যেয়ো না, আমি হাতে ধ'রে বলছি আর যেয়ো না।'

শাশুড়ির মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁর জীবনের সব ইতিহাসটাও পাঠ করলো নন্দিনী, নিজের মায়ের চেয়েও অধিক ভালোবাসায় ভ'রে গেলো বুক।

দামিনী দাঁড়িয়ে ছিলো, তিনি বললেন, 'শোনো, বাছা, এ-সব নিয়ে যেন তুমি আবার আমার ছেলের কানে লাগাতে যেয়োনা, বুঝেছো? সব বাড়িতেই পুরুষরা এ-রকম অবুঝ থাকে, স্বেচ্ছাচারী থাকে, সব মেয়েরাই এ-রকম লুকিয়ে-পালিয়ে এখানে-ওখানে যায়, কিছু নতুন নয়। আমিও এ-রকম ক'রে দু'বার বাপের বাড়ি গিয়েছিলাম।'

'তা যা বলেছেন গিন্নীমা', দামিনী তৎক্ষণাৎ মাথা হেলালো এবং নবীন বাড়ি ফিরলে তক্ষুনি গিয়ে কানে লাগালো। বললো, 'বুঝলেন দাদাবাবু দুষ্টু গোরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো। আমি আপনার বৌ সামলাতে পারবো না, এ টান যে বাপু মরণের চেয়ে বেশি। আবার আজ চ'লে গেলো! তাজ্জব। তাজ্জব। আর আপনার মা-ও তেমনি, তানার আস্কারাতেই তো এতো সাহস। মান্য মাননা আছে নাকি? এমন তরিবৎহীন বৌ আমি বাপের জন্মে দেখিনি। আমাকে আপনি খালাস ক'রে দিন, চ'লে যাই। আপনিই যাকে শাসনে রাখতে পারছেন না, সে কি আর কারো কথা শুনবে? এমন যার একটা বাঘের মতো মালিক — '

দামিনীকে এক ধমক দিয়ে ঘর থেকে বার ক'রে দিলো নবীন। তারপর খাওয়া-দাওয়া চুকে গেলে দরজা বন্ধ ক'রে স্ত্রীকে শাসন করলো। বাক্য বাণে নয়, অনর্থক জিজ্ঞাসাবাদে সময় নষ্ট ক'রে নয়, কঠিন পেশীবহুল শক্ত হাতের আচমকা একটি থাপ্পরে সে উল্টিয়ে ফেলে দিলো। সেই চড়ের বেগ সামলাতে নন্দিনীর সময় লাগলো। বোবা চোখে চুপ ক'রে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার মনে হচ্ছিলো,

চোখ থেকে বুঝি ডেলা-ডেলা রক্ত ছিটকে বেরিয়ে এলো। সে অন্ধকার দেখছিলো।

নবীন বললো, 'মনে থাকবে?'

নন্দিনী বললো, 'থাকবে।'

স্ত্রীকে এবার সমুচিত শিক্ষা দিয়েছে ভেবে নবীন খুশি হ'লো। স্ত্রীর বিনীত ভাব দেখে আর কিছু বললোও না এবং সেই রাত্রে নন্দিনী মাটিতেই প'ড়ে থাকলো, নবীন খাটে ঘুমিয়ে রইলো।

পরের দিন বেরুবার সময় নবীন একবার ভেবেছিলো তালা বন্ধ ক'রে রেখে যাবে কিনা বৌকে, একটু লজ্জা হ'লো তারপর। সেটা বড্ড বেশি বাড়াবাড়ি হ'য়ে যাবে, লোকের কানে যাবে কথাটা। দুর্নাম হবে। এ তো ঘরে ঘরে শাসন, জানতে যাচ্ছে কে, আর নন্দিনী যে ম'রে গেলে ও কারো কাছে এসব কথা দন্তস্ফুট করবে না তা-ও সে জানে। তাছাড়া কালকের পরে আজকে আর যাবার মতো সাহস তার কখনোই হবে না। যদি হয়ও তার বিধানও তো তারই হাতে। পালাবে কোথায়?

একটু খারাপও লাগছিলো নবীনের। এ-রকম গায়ে হাত তোলা এই প্রথম। চীৎকার চ্যাঁচামেচি করা, হাত মুচড়ে দেওয়া, ধাক্কা মারা, কাঁধ ঝাঁকানো, এগুলো করেছে কিন্তু একেবারে সোজাসুজি অতবড়ো একজন মেয়েকে, অত লেখাপড়া যে জানে তাকে চট ক'রে থাপ্পর মারা রীতিমতো কল্‌জের দরকার। হ্যাঁ, সে কল্‌জে তার আছে। বিদ্যার গৌরবে তো একদিন ধরাকে সরা জ্ঞান করেছিলো, সেই সরা যে সে এক লহমায় ভেঙে দিকে পারে সেটা অন্তত বুঝিয়ে দিতে পেরেছে।

অত বুঝিয়ে দিয়েও নবীন কোথায় যে হেরে থাকে, কোথায় যে মার খেয়েও সেই বিদ্বান মেয়েটি তেমনি বিদ্বানই থেকে যায় সে কথাটাই সে বুঝতে পারে না। যখন নন্দিনী চুপ ক'রে তাকিয়ে থাকে, প্রতিবাদের একটু ভঙ্গিও করে না তখনি সবচেয়ে বেশি রাগ

হয়, বেশী আক্রোশ হয়, মনে হয় গলা টিপে মেরে ফেলে। হয়তো ফেলবে কোনোদিন, কে জানে। কিন্তু সত্যি তো সে তা চায় না! আজকাল কাজ করতে করতে তাই প্রায়ই অন্যমনস্ক হ'য়ে যায়, যা তার একান্তই স্বভাব বিরুদ্ধ।

মনে মনে ভাবে কেন বা মরতে এই মেয়েকে বিয়ে করলাম! কেন একজন এমন মেয়ে বাছলাম না যে আমাকেই প্রভু ব'লে মানতো, জানতো, যার ধারণায় পতি পরম গুরু শব্দটা অব্যর্থ। আমাকে সেবা করেই যার জীবন মন ধন্য হ'য়ে যেতো। আমি তাকে মুড়ে রাখতাম সোনা দিয়ে, যেমন শাসন করতাম, তেমনি আদর দিয়েও মাথায় উঠোতাম। কিন্তু এ যে কেউটে সাপ, এর নিঃশব্দ ছোবলে নবীন নামের দুর্ধর্ষ লোকটা বিষে নীল হ'য়ে থাকে সর্বদা।

বেরুতে গিয়েও নবীন ফিরে এলো ঘরে। সকাল থেকে স্ত্রীর কালসিটে পরা গালের দিকে তাকিয়ে বেশি ভালো লাগছিলো না। চোখটা টকটকে হ'য়ে আছে, মনে হচ্ছে যে কোনো মুহূর্তে রক্ত ফেটে বেরুবে। না, অত জোরে মারা উচিত হয়নি তার। ম'রে যে যায়নি তাই ঢের।

ঘর গুছোচ্ছে নন্দিনী। স্বামীরই ছেড়ে রেখে যাওয়া জামা-কাপড় পাট করছে, আয়না মুছছে, বেড-কভার ছড়াচ্ছে, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে দেখতে ঘুর ঘুর করলো একটু, দু'একটা অহেতুক কথা বললো, কিন্তু নন্দিনীর অটুট নৈঃশব্দ তাতে একটুও চিড় খেলো না। আবার তার অনুতপ্ত রক্ত ফুটে উঠলো টগবগ ক'রে, বড়ো নিঃশ্বাসে গর্জে বললো, 'আমি ফিরে আসবো। যেন আর এক পা কেউ বাড়ি থেকে না বেরোয়।' বলেই ছিটকে শব্দে বেরিয়ে গেলো।

তা বেরুলোও না নন্দিনী। আলমারি নাড়া দিয়ে বসেছিলো, ভূপতি এলো। অকৃত্রিম খুশিতে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠে বললো, 'আরে তুমি! হঠাৎ! কী ব্যাপার?'

'ভীষণ আসতে ইচ্ছে করলো, অসুখের ফাঁকি দিয়ে চ'লে এলাম।'

'বেশ করেছো, খুব ভালো করেছো।'

'তুমিই বলো, অসুখ কি মানুষের করে না। আর সত্যি ও-যে করেনি তা-ও নয়, ভীষণ — , হ্যাচ্চো — ' প্রচণ্ড জোরে হাঁচলো সে, বস্তুতই তার সর্দি হয়েছে খুব।

নন্দিনী বললো, 'একটু হট বাথ নেবে? জল ফুটিয়ে এনে দেবো?'

মুখের দিকে তাকিয়ে কী বলতে গিয়ে ভূপতি অবাক হ'য়ে বললো, 'এ কি! তোমার চোখটা এরকম ফুলেছে কেন, লাল হয়েছে কেন? ঈশ্‌শ্‌! আর গালে কীরকম রক্ত জমাট হ'য়ে সিঁটে গেছে। কী হয়েছে বৌদি?'

'কই কিছু না তো।'

'কিছু না মানে?'

'কিছু না মানে কিছু না। সর্দি হয়েছে, গরম গরম লুচি খাবে না কি বেগুন ভাজা দিয়ে? আর আদা দিয়ে চা?'

'তোমার ওস্তাদ কেমন আছেন?'

'আমি কী ক'রে জানবো? তুমি তো নিয়ে গেলে না, চ'লে গেলে।'

'সব খবরই জানি। মা বললেন আসা মাত্র।'

নন্দিনী আলমারির তাক থেকে তাকে কী যে খুঁজতে লাগলো, জবাব দিলো না।

ভূপতি বললো, 'লেখাপড়ায় তো এতো ভালো ছিলে, আরো পড়াতেও রাজি ছিলেন তোমার বাবা, পড়লে না কেন বলো তো?'

'কী আর হ'তো ?'

'কী হ'তো ? কী না হ'তো ? কলকাতায় শুনেছি কতো মেয়ে কলেজ আছে, মেয়েরাই পড়ান সেখানে, তুমিও পড়াতে।'

'তা হ'লে কী ক'রে তোমার সঙ্গে বন্ধুতা হ'তো।'

'দেখা না হ'লে আমার বন্ধুতার জন্য তো আর তোমাব কোনো অভাব বোধ হ'তো না।'

'হ'তো, বুঝতাম না, আর জানতেও পারতাম না সারাজীবন এমন একজন ছেলের সঙ্গে আমাব দেখা হ'লো না। এটা ক্ষতি না ?'

'ইযার্কি আর করতে হবে না। তুমিও বাপু একটু খেয়ালী আছো। পডতে পড়তে আবার তুম ক'বে গান শিখতে গেলে কেন ?'

হাসিমুখে নন্দিনী বললো, 'কেন, গান তুমি ভালোবাসো না ? তবে গীতাঞ্জলি কিনেছো কেন ?'

'গান শিখতে শিখতে আবাব তুম ক'বে বিয়েই বা কবলে কেন ?'

'বললাম তো তা না হালে তোমার সঙ্গে দেখা হ'তো কী ক'বে ?'

'.কাথাও ধাক্কা খেয়েছিলে ?'

'না তো।'

'তবে তোমার চোখে গালে অত আঘাত লাগলো কী ক'রে।'

'ঠাকুরপো, তোমার বয়েস কতো ?'

'কেন ?'

'বলো না।'

'তোমার চেয়ে বেশি ছোটো নই আমি, বুঝলে ?'

'তোমার বিয়ে হ'লে বেশ হয়।'

'বিয়ে! বাব্‌বা ?'

'বাব্‌বা কেন ?'

'একজন বিয়ে ক'রেই যা দেখাচ্ছেন।'

'তোমার বিয়ে হ'লে মার একজন বেশ সঙ্গী হয়।

'তুমিই তো আছো।'

'আমি ? আছি ?'

'আছো না। বৌদি, আমরা তোমাকে খুব ভালোবাসি।'

'জানি।'

'কিন্তু তাতে তো আর যা নেই তা পূরণ হয় না।'

নন্দিনী অন্যমনস্ক হ'লো।

'আগে দাদার প্রতিজ্ঞা ছিলো বিয়ে করবেন না। ওঁর কাজই ছিলো ওঁর বৌ। দাদার অর্থ উপার্জনই ছিলো তাঁব ব্রত। শেষে এতো বয়সে কেন বা এই দুর্মতি হ'তে গেলো!'

'দুর্মতি কী? লোকে বিয়ে করবে না?'

'আমরা অবিশ্যি তখন বেশ খুশিই হয়েছিলাম। ক'জন মেয়ে দেখেছি জানো?'

'ক'জন।'

'গুণে গুণে তেতাল্লিশ জন।'

'সে কী! এতো মেয়ে আছে এই তল্লাটে?'

'নেই! ঝাঁকে-ঝাঁকে সম্বন্ধ আসতো। বলতে গেলে মেয়েদের বাপ ভাইয়েদের দাদা মাছি মশার মতো কাচিয়ে তাড়াতেন।'

'এতো বেছে শেষে এই?'

'বাবা, তুমি কি একটা সোজা মেয়ে? তোমাকে নিয়ে তো তখন শহর তোলপাড়।'

'তাই নাকি?'

'আমরা ছবি দেখলুম কাগজে। দাদা অনেকক্ষণ ধ'রে দেখেছিলেন, বলেছিলেন, মেয়েটা দেখতেও ভালো।'

'কী ভাগ্য!'

'বোধহয় তখুনি মনে মনে একটা ইচ্ছে হয়েছিলো।' গলা খাটো করলো, 'আসলে টাকা থাকলে কী হবে, নিজে তো লেখাপড়া জানেন না, একটা লেখাপড়া জানা মানুষকে ও-রকম অধীন ক'রে রাখা কি সোজা গৌরব? এক ধরনের প্রতিশোধও, আবার এক ধরনের ইচ্ছে পূরণও—'

নন্দিনী হাসলো, 'ও বাবা, তুমি দেখছি একেবারে মনস্তত্ত্ববিদ।'

'দাদাকে আমি খুব ভালো ক'রে জানি, শেষের দিকে দাদার এমন

জেদ উঠে গিয়েছিলো তোমাকে বিয়ে করবার জন্য —' চারদিকে তাকালো, 'দামিনীটা কোথায় কে জানে, ওটাকে আমি সহ্য করতে পারি না। এই তোমার পার্সোনাল সহচরী? ওটাকে বরদাস্ত করো কী ক'রে?'

'আমি তো অধীন মাত্র, যিনি রেখেছেন বরদাস্ত করা না করার ভার একান্তভাবেই তাঁর।'

'ওটাকে ভয় পাই আমি। মা বলেন, ও-ই সব লাগিয়ে লাগিয়ে দাদাকে আরো ক্ষ্যাপায়।'

'ওর দোষ কী। মাইনে নিচ্ছে কাজ দেবে না?'

'এই বুঝি ওর কাজ? তুমি ও-রকম নিষ্ক্রিয় হ'য়ে থেকোনা তো।'

'কী করবো?'

'ঝগড়া করবে।'

'ঝগড়া!'

'দাদা তোমাকে প্রথমে কোথায় দেখেন জানো?'

'কোথায়?'

'আলমামুদের বাড়ির পথে।'

'তোমাকে বলেছিলো?'

'আমি সব জানি। তারপর তোমাকে দেখতে গেলেন একদিন। তুমি নাকি অপমান করেছিলে—'

'অপমান? কখন করলাম?'

'যাঁর নাম নবীনচন্দ্র মিত্র মজুমদার, যাঁকে শহরের প্রত্যেকে মান্য করে, টাকার যাঁর অন্ত নেই ব'লে কিম্বদন্তী তাকে অপমান! দাদা ক্ষিপ্ত হ'য়ে বাড়ি ফিরেছিলেন। রেগে গিয়ে কী যে বলেছিলেন আর কী যে বলেননি তার ঠিক নেই।'

'এই নাও, নন্দিনী হাত বাড়ালো।'

'কী?'

'এই আংটিটা আমি তোমাকে দিলাম।'

'আংটি! কেন?'

'আর এটা তোমার বৌয়ের জন্য।' একজোড়া ঝকঝকে কানবালা দেখালো সে।

'বৌ! রাম না জন্মাতেই রামায়ণ?'.

একটা থলিতে গয়না ভরছিলো নন্দিনী, শ্বশুর বাড়ির গয়না নয়, বাপের বাড়ির। এখান থেকে ওখান থেকে টাকা বার করছিলো, 'সব আশীর্বাদের টাকা। একটা টাকা খরচ হয়নি তা থেকে, সব তেমনি প'ড়ে আছে আলমারিতে। সাধ আহ্লাদের কোনো প্রশ্ন না থাকলে আর টাকার মূল্য কী?'

ভূপতি বললো, 'এতো সব নাড়া দিয়ে বসেছো কেন আজ?'

'গুছিয়ে রাখি। এলোমেলো হ'য়ে আছে কবে থেকে।'

'বা ও-সব গয়না-ফয়নাগুলো আবার বার করছো কেন?'

'আংটিটা পরো না।'

'য্ যা —'

'কেন?'

'আমি ভালোবাসি না।'

'তোমার দাদা তো পরেন।'

'দাদা তো পরেন না, দাদা ধারণ করেন, নীলা পলা হীরে —'

'এটা হীরে, পরো না, আমার আঙুলে ঢল ঢল করে —'

'হীরে নাকি? দেখি। বাঃ সুন্দর তো।' আঙুলে পরলো ভূপতি, একটু আঁটো হ'লেও লাগলো, পাঁচটি হিরে দিয়ে গাঁথা ফুলের আংটিটা। ভীষণ পছন্দ হ'লো। তবু লজ্জা ক'রে খুলছিলো, নন্দিনী কিছুতেই খুলতে দিলো না।

নবীন একটু তাড়াতাড়িই বাড়ি ফিরে এলো সেদিন। ভয় ভয় নিয়েই এসেছিলো, বৌকে দেখে আশ্বস্ত হ'লো। যাক, শাসনের কিছু ফল ফলেছে তবে। দামিনীর মুখেও কোনো অভিযোগের সুর শোনা গেলো না। দাদা আসার আগেই ভূপতি পালিয়েছিলো, তবু এসেছিলো খবর শুনেই যা একটু ভুরু কুঁচকোলো।

সন্ধেটা ভালোই কাটলো। রাত্রিটা স্ত্রীকে আদর করতে করতেই ভোর হ'য়ে গেলো। সেই আদরের জেরে নন্দিনী সকাল বেলা উঠতে পারছিলো না। নবীন বললো, 'না না উঠতে হবে না, কোনো কাজ করতে হবে না তোমাকে, তুমি শুয়ে থাকো।' তারপর হাসলো, 'এইবার আমাদের আর একটি সন্তান আসা উচিত, কী বলো?' আমি ছেলেই চাই। তুমি?'

'আমি? জানি না।' নন্দিনী পাশ ফিরে শুলো।

উঠলো একটু বেলায়। শাশুড়ি অস্থির হ'য়ে বারে বারে বললেন, 'আর তোমাকে রান্না ঘরে আসতে হবে না, যাও, চান-টান ক'রে শুয়ে থাকো গিয়ে। চেহারা কী খারাপ হ'য়ে গেছে।' তবু নন্দিনী শুনলো না, শাশুড়ির পায়ে-পায়েই ঘুরতে লাগলো, তারপর এক সময়ে নিখোঁজ হ'লো।

বেলা দুটোর সময় দুপুরের খাওয়া খেতে বাড়ি ফিরলো নবীন। বাড়িটা থম থম করছিলো, নবীনের মা উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে বসেছিলেন, দামিনী রাস্তার এ-পাশ ও-পাশ খুঁজে বেড়াচ্ছিলো, নবীনকে দেখে তাদের হাত পা ঠাণ্ডা হ'য়ে এলো।

'কী! কী হয়েছে?' নবীন আতঙ্কিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলো মাকে। মা ভীত কম্পিত গলায় বললেন, 'বৌমা কোথায়?'

'কোথায় তা আমি জানবো কী ক'রে? জানবার কথা তো তোমাদের।'

'আমি তো রান্না ঘরে ছিলাম, ঘরে এসেছি বারোটার সময়ে, তখন দামিনী বললো, বৌমা নাকি ঘরে নেই, বাথরুমেও নেই, কোথাও নেই।'

'তা হ'লে সে এতোক্ষণ কী করছিলো? তাঁকে আমি রেখেছি কী জন্য? দামিনী দামিনী —'

নবীনের চিৎকার চ্যাঁচামেচিতে ভ'রে গেলো ঘর দুয়ার। বাড়িঘর লণ্ডভণ্ড হ'য়ে গেলো।

'এই তুমি, তুমি, তোমার জন্যই এসব হচ্ছে বারে বারে, তুমিই

তাকে পাঠাচ্ছো, যেতে অনুমতি দিচ্ছো, আমি এর সমুচিত শিক্ষা দিয়ে ছাড়বো তোমাকে —' মার দিকে সে মারমূর্তি হ'য়ে তেড়ে-তেড়ে যেতে লাগলো, এক ধাক্কা মেরে দামিনীকে বার ক'রে দিলো বাড়ি থেকে, অন্যান্য লোকজন কর্তার সংহার মূর্তি দেখে ভয়ে কে যে কোথায় পালাবে ঠিক করতে পারলো না।

না খেয়ে না দেয়ে শেষে লোক নিয়ে হাণ্টার নিয়ে জিপ হাঁকিয়ে সে বেরিয়ে গেলো।

বেলা প্রায় আড়াইটা, রোদের প্রচণ্ড তেজ খাঁ-খাঁ করছে পাহাড় তাতিয়ে, তারি মধ্যে খাঁজে-খাঁজে খেলা করছে আলো ছায়া, উঁচু-নিচু বেয়ে জিপ টিলার তলাকার সমতলটুকুতে এসে থামলো, যেখানে ওস্তাদজির কুটির। নবীন যাকে বলে আখড়া, যে আখড়াকে আজ সে ধুলোয় মিশিয়ে দিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তার প্রথম শিকার হবে সেই আখড়ার মোছলমান কয়েদীটা, যেটা কোথায় কার সর্বনাশ ক'রে এখানে এসে লুকিয়ে দাড়ি রেখে ফকির সেজেছি।

তারপর দেখা হবে সেই স্ত্রীলোকটার বাপ-ভাইয়েদের সঙ্গে, যারা জোচ্চোরি ক'রে একটা নষ্ট মেয়ে ছেলে গছিয়ে দিয়েছে তার ঘাড়ে। আর তারপর? তারপর সে দাঁড়াবে সেই আসল মানুষের মুখোমুখি। দাঁতে দাঁত পিষলো, কড়মড় শব্দ হ'লো।

কুটিরের কাছে এসে হাণ্টার ঘুরোতে ঘুরোতে লাফিয়ে নামলো নবীন, বেগে গিয়ে ঘরের মধ্যে প্রবিষ্ট হ'লো। ঘর শূন্য। একটা দড়ির খাটুলি প'ড়ে আছে একা একা, আর একটা গামছা। সংলগ্ন রান্নাঘরে কয়েকটা মাটির ভাণ্ড বাটি।

'কই? কোথায়? কোথায় সে হারামজাদী।' মুখ দিয়ে তার খারাপ কথা বেরিয়ে এলো। দরদর ক'রে ঘাম ঝরছিলো সারা শরীরে, ক্রোধে উন্মত্তের মতো লাগছিলো, সেই শূন্য ঘরের আনাচ-খুঁজতে লাগলো সে, এখানে-ওখানে হাণ্টারের চাবুক চমকাতে লাগলো।

তারপর সেই জিপ নিয়ে এই প্রথম শ্বশুর বাড়িতে এলো। একটা দানবের মতো আচরণ করলো এসে, বাড়ির লোকেরা উদ্‌ভ্রান্ত হ'লো, হতভম্ব হ'লো, তারপর কাঁদতে বসলো।

সেখান থেকে নবীন ছিটকে বেরিয়ে এলো আবার, তারপর কোথা থেকে যে কোথায় না খুঁজলো ঠিক রইলো না কোনো। শেষে পুলিশে খবর দিলো।

২৫

কাজটা খুব ঠাণ্ডা মাথায়ই করেছিলো নন্দিনী। খুব ভেবে চিন্তে। খুব সন্তর্পণে। কয়েকদিন ধ'রে সে আত্মহত্যার কথাই ভাবছিলো। সেই ভাবনা সফল করতেই সে বদ্ধপরিকর হয়েছিলো। এমন কি বাড়ির ঝাড়ুদারকে প্রচুর ঘুষ দিয়ে এক ডেলা আফিং পর্যন্ত সংগ্রহের ব্যবস্থা ক'রে ফেলেছিলো।

কিন্তু নিজের নিষ্পাপ নরম গালে স্বামীর থাপ্পড় হঠাৎ তাকে সে ইচ্ছে থেকে বিরত করলো। তৎক্ষণাৎ মনে হ'লো, না, মৃত্যু নয়, জীবন। জীবনকে পেতে হবে। যে জীবন কারো অধীন নয়, আশ্রিত নয়, মুখাপেক্ষী নয়। যে জীবন একা তার, একজন সাবালক মানুষের। মরবে কেন? কী দুঃখে মরবে? মৃত্যু তো পরাজয়। মৃত্যু অক্ষমের উপসংহার। আর কী উপসংহার! যার কারণ একটা দাম্ভিক মূঢ় অপরিণত মস্তিষ্কের অর্ধ উন্মাদ মানুষ মাত্র। না, কক্ষণো না। এই সম্মান তাকে কিছুতেই দেবো না।

দেড়দিন দুইরাত এ-ছাড়া আর কিছুই ভাবেনি সে। চলতে-ফিরতে-বসতে-শুতে-খেতে সব সময়েই এই এক ভাবনাতেই মগ্ন হ'য়ে থেকেছে। স্বামী বেরিয়ে গেলেও এ-কথাই ভেবেছে, ঘরে থাকলেও তাই ভেবেছে! শাশুড়িকে কাজে সাহায্য করতে করতেও ভেবেছে,

দামিনীর গোয়েন্দাগিরি দেখতে দেখতেও ভেবেছে। এই ভাবনার পোকারা তাকে রাত্রিবেলাও ঘুমুতে দেয়নি। দিনের বেলাও তিষ্ঠোতে দেয়নি। তারপর সকালে শান্তমনে আলমারি গুছোতে বসেছে। কিছু কাপড় আলাদা ক'রে মুড়ে নিয়েছে কাগজে, স্বামীর দেয়া না, তার নিজের পিতৃদত্ত প্রতিটি গয়না ভ'রে নিয়েছে হাত ব্যাগে, সেই সঙ্গে আশীর্বাদে পাওয়া ছ'শো পঁচাত্তর টাকা, দু'খানা গিনি, একখানা মোহর।

একজন মানুষের দাঁড়াবার পক্ষে কম মাটি নয়। কিন্তু তারপর?

তারপরও জানে বৈকি। এক দুই তিন ক'রে অঙ্ক ক'ষে ক'ষে সব পদ্ধতি সে সাজিয়ে নিয়েছে মনের মধ্যে। পালাবার সময় ঠিক সেই দাগ ধ'রে ধ'রেই পা ফেলেছে।

শুধু শাশুড়ির জন্য এতো কষ্ট হচ্ছিলো যে, বারে বারে চোয়ালটা ব্যথা ক'রে উঠছিলো। কিন্তু উপায় কী? ভুল ক'রে জঙ্গলে ঢুকে বাঘ দেখলে কি মানুষ না পালিয়ে পারে? আত্মহত্যা যেমন পাপ, আত্মরক্ষা না করাও তার চেয়ে কম অন্যায় নয়। সম্ভব হ'লে সে শাশুড়িকেও নিয়ে পালাতো কিন্তু তাতো আর হয় না।

এই শহর তার জন্মভূমি, এই শহরের প্রতিটি রাস্তা তার নখদর্পণে। চার বছর সে কলকাতা থেকেছে এবং এই চার বছরে অন্তত চোদ্দোবার যাওয়া-আসা করেছে। কখনো বাবার সঙ্গে, কখনো একা একা। পাঁচ মাইল দূরের যে ছোট্ট এয়ার পোর্ট, যেখান থেকে মালের বিমান ছাড়ে, যার নাম কার্গো, যার ভাড়া মনুষ্যবাহী বিমানের অর্ধেক, যে বিমান ঘরর ঘরর আওয়াজ তুলে বস্তুতই মালগাড়ির মতো ঢিকোতে ঢিকোতে দশটা পঞ্চান্ন মিনিটে রওনা হয় কলকাতার দিকে, সেই বিমানটিই ছিলো তার যাতায়াতের একমাত্র বাহন। সেই বিমানটির সময় হিসেব করেই সে বেরুলো।

সকাল থেকেই সময় বিষয়ে সাবধান ছিলো, ঘড়ি ধরে-ধরেই চলেছে, সেদিকে তাকিয়ে-তাকিয়েই শুয়েছে বসেছে. নজর রেখেছে বাড়ির লোকজনের গতিবিধির উপর, দামিনীর দিকে — তারপর

বেরিয়েছে। আজ পুকুরের ধার দিয়ে যায়নি, গিয়েছে নিকিরি পাড়ার ভিতর দিয়ে, সেখান দিয়ে গিয়ে উল্টো পথে ট্যাক্সী স্ট্যাণ্ডের দিকে এগিয়েছিলো। ভাগ্য ভালো স্ট্যাণ্ড পর্যন্তও যেতে হয়নি, তার আগেই একটি ফিরতি ট্যাক্সী পেয়ে গেলো। তাড়াতাড়ি উঠে ব'সে বন্ধ ক'রে দিলো দরজা জানালা, মুহূর্তের মধ্যে চ'লে এলো মামুদ সাহেবের কুটিরের কাছে।

নেমে প্রায় দৌড়ে এসে বললো, 'চলুন। তাড়াতাড়ি চলুন।'

জানালা দিয়ে চুপচাপ দূর পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে ব'সে থাকা অসুস্থ মামুদ সাহেব বললেন, 'কোথায়?'

'সব বলবো, আগে গাড়িতে আসুন।'

'গাড়িতে!'

'উমনি, উমনি —' রান্নাঘর থেকে উমনিকে টেনে আনলো, 'শীগ্‌গির চলো শীগ্‌গির। ওস্তাদজিকে ভালো ডাক্তার দেখাতে আমি কলকাতা নিয়ে যাচ্ছি —'

'কলকাতা!'

'আর কথা না, সময় নেই প্লেন ছেড়ে দেবে — আপনি গাড়িতে চলুন ওস্তাদজি, ট্যাক্সী দাঁড় করিয়ে রেখেছি —'

'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না মা —'

এখান থেকে ওখান থেকে ওস্তাদজির কাপড়-চোপড় জিনিসপত্র টেনে জড়ো ক'রে পোঁটলা বাঁধতে বাঁধতে নন্দিনী বললো, 'কিচ্ছু বোঝবার দরকার নেই, আপনার ফুসফুসের অসুখ, আমি কলকাতা নিয়ে গিয়ে ডাক্তার দেখাবো, সব বন্দোবস্ত করেছি।'

'কী বললে তুমি?'

'কোনো কথা নয়, কোনো প্রশ্ন নয়, আপনাকে আমি পথে সব বলবো। এই আমার বেঁচে থাকার শেষ যুদ্ধ, এই হারজিতের উপরই আমার সব নির্ভর করছে। আপনি অনর্থক কথা ব'লে আপনার এই দুঃখীনি কন্যাকে বিপন্ন করবেন না, চলুন।'

'মা —'

'সময় নেই, সময় নেই, আপনি শুধু জেনে রাখুন আপনি ছাড়া আমার কেউ নেই,' গলাটা ভেঙে ভেঙে আসছিলো, তানপুরাটা তুলে নিলো কাঁধে উমনির হাতে বোঁচকাটা ছুঁড়ে দিলো।

ওস্তাদজি অসুস্থ দেহে মোহাচ্ছন্নের মতো নন্দিনীর পায়ে পা ফেলে এগুলেন।

তীব্র বেগে ছুটে ট্যাক্সী চলে এ'লো এরোড্রাম, জাহাজটি প্রায় কাঁটায়-কাঁটায় ধ'রে ফেললো নন্দিনী। যাত্রী প্রায় ছিলোই না সেদিন। মাল ছাড়া তারা তিনজন আর দু'জন খাসিয়া ভদ্রলোক। বিমান আকাশে উড়লো আস্তে আস্তে, মাটি প'ড়ে রইলো পায়ের তলায় বিচিত্র ছবি হ'য়ে, নন্দিনী সেই সময়ে সমস্ত কথা খুলে বললো ওস্তাদজিকে। সব শুনে ওস্তাদজি চোখ বুঁজে প্রায় ধ্যানস্থ হ'য়ে রইলেন।

আকাশে উড়তে উমনি ভয় পাচ্ছিলো, তার কান কট কট করছিলো, সেই সঙ্গে খুশিও ছিলো খুব। এই ফকির সাহেবের কাছেই সে উৎসর্গীকৃত, বাবাকে দেখাশুনো করা আর বাবার আশ্রয়ে থাকা ছাড়া অন্য কোনো ইচ্ছে তার মনের কোথাও নেই। সেই বাবার অসুখে তার দিনরাত কান্নায় ভরা থাকতো, বহিন বাবাকে বড়ো ডাক্তার দেখাবে, ভালো ক'রে, সুস্থ ক'রে ফিরিয়ে আনবে এর চেয়ে বেশি আর কী ভাবতে পারে সে?

দেখতে দেখতে দমদম এসে পৌঁছে গেলো প্লেন। পাক খেয়ে-খেয়ে মাটি ছুঁলো। নন্দিনী একহাতে ভীত বিহ্বল উমনি আর এক হাতে অসুস্থ ওস্তাদজিকে ধ'রে নেমে এলো সিঁড়ি বেয়ে, চত্বর পার হ'য়ে লবিতে ঢুকলো। গিস-গিস করছে মানুষ, কেমন ভয়-ভয় করছিলো। উমনিকে আর ওস্তাদজিকে বসিয়ে বাইরে ট্যাক্সীর সন্ধানে এলো। আর এসেই হঠাৎ একটা মুক্তির আশ্বাসে সারা দেহমন পবিত্র হ'য়ে গেলো।

কী সুন্দর আকাশ! কী মধুর বাতাস। কী মিষ্টি গন্ধ।

ট্যাক্সী পেতে কিছুটা ধ্বস্তাধ্বস্তি করতে হ'লো, তবুও পেলো। ওস্তাদজি আর উমনিকে নিয়ে সোজা চলে এলো একটি পরিচিত হোটেলে। কলেজে ভর্তি হ'তে এসে প্রথমবার কলকাতার এই হোটেলটিতে তাকে নিয়ে উঠেছিলেন তার বাবা। কে একজন এটার ঠিকানা দিয়ে দিয়ে দিয়েছিলো বাবাকে। তারপরেও বাবা এলে এখানেই উঠতেন। প্রথম প্রথম একা আসা-যাওয়া করতে পারতো না নন্দিনী। পারতো না ঠিক নয়, মা বাবা দিতেন না। এই হোটেলই ছিলো তাদের আস্তানা। নন্দিনীকে বোর্ডিংয়ে পৌঁছে দিয়ে বাবা এক আধ রাত থেকে যেতেন এখানে।

দোতলায় ঘর পাওয়া গেল একখানা। ওস্তাদজি বললেন, 'তারপর ?'

নন্দিনী বললো, 'আমার সব ভাবা আছে, আপনি ব্যস্ত হবেন না।' এই ব'লে গুছিয়ে বসে খেয়ে-দেয়ে তার পরিচিত পাড়া ভবানীপুরে এলো। বন্ধুর বাড়ি। বন্ধু বিবাহিত। তার অনেক আগেই এর বিয়ে হয়েছিলো, মনে আছে বোর্ডিং সুদ্ধু মেয়ে বিয়ের ভোজ খেতে এসে অনেক হল্লা ক'রে গেছে। তারও পরে এ বাড়িতে এসেছে অনেকবার। অবশ্য সেই আসা আর এই আসায় অনেক তফাৎ। কিন্তু সাহায্য তো কারো পেতেই হবে ?

তা পেলো। বিনিময়ে অবশ্য অনেক কথাই গোপন করতে হ'লো, যেমন তার বিবাহ। সিঁদুর মুছে নন্দিনী নন্দী সেজেই এলো সে। প্রথম কথা সে একটি ব্যাঙ্কে কিছু গয়না গচ্ছিত রেখে টাকা চায়, আর একটি ছোটো ফ্ল্যাট। বললো অসুস্থ বাবাকে চিকিৎসা করাতে নিয়ে এসেছি, লোকবল আমাদের নেই, আমিই বাবার একমাত্র ভরসা, অতএব সব কিছুই আমাকে করতে হবে।

'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই' বন্ধুর স্বামী তক্ষুণি ব্যাঙ্কে নিয়ে গেলেন, দু'চারটা খালি ঘরেরও খোঁজ দিলেন। ভাড়ার কথা না ভেবে একটা তিন ঘরের ফ্ল্যাট বাথরুম সহ, ঠিকও ক'রে ফেললো নন্দিনী। তারপর ফিরে এলো।

ওস্তাদজি বিমর্ষ চিন্তিত মুখে আবার বললেন, 'তারপর ?'

নন্দিনী আবার বললো, 'আমার সব ভাবা আছে, আপনি ভাববেন না।'

ভাবা সবই ছিলো। সেই মতো এগিয়ে শনৈঃ শনৈঃ সফলতার দিকেও এগিয়ে এসেছিলো। গয়না বন্ধক রেখে হাত ভরা ছিলো ব'লে অর্থাভাবের প্রশ্ন ওঠেনি। জীবিকা কী হবে তার জন্যও চিন্তা হ'লো না। তিন ঘরের ফ্ল্যাটের একটি ঘরকে সে গানের ঘর ক'রে জনা তিনেক ছাত্রীও যোগাড় ক'রে ফেললো, টিউশনি পেলো একটা, তারপর ডাক্তার ডেকে ওস্তাদজির বুক পরীক্ষা করালো। এই সব ধান্দায় কখন যে একটা মাস কেটে গেলো বুঝতেই পারলো না। কিন্তু ভালো লাগলো খুব। এই স্বাধীন জীবনের স্বাদ তাকে এতো পরিশ্রমেও ক্লান্ত হ'তে দিলো না বরং উদ্যম বাড়ালো। এখানে-ওখানে চাকরি খুঁজতে লাগলো, আশাও পেলো দু'চার জায়গা থেকে, তারপর একদিন সকালে দরজায় টোকা শুনে খুলে দিয়েই আঁৎকে উঠে দেখলো পুলিশ।

২৬

খুঁজে খুঁজে নবীনচন্দ্র মিত্র মজুমদার তাকে ঠিক ধ'রে ফেলেছে। কোনো কথা বলার সময় দিলো না, কোনো যুক্তিতর্কের অবকাশ হ'লো না, ওস্তাদজির দিকে একবার পিছন ফিরে তাকানো গেলোনা পর্যন্ত। একটা আস্ত সুস্থ প্রায় পঁচিশ বছর বয়স্ক সাবালক সক্ষম স্বেচ্ছায় গৃহ-ত্যাগী মেয়েকে নিয়ে আবার গৃহের কারাগারে বন্দী ক'রে হা হা করে হেসে উঠলো নবীন।

'এবার ! এবার কোথায় যাবে ?'

তাই তো এবার আর কোথায় যাবে !

ঘুঘু দেখেছো ফাঁদ ছাখনি।'

নন্দিনী বিহ্বল ভাবে বললো, 'আমাকে নিয়ে এলে কেন?'

'তুমি যে আমার স্ত্রী।'

'স্ত্রী!'

'স্ত্রী না? অগ্নি সাক্ষী ক'রে বিয়ে করেছিলুম যে একদিন।'

'কিন্তু তুমি তো আমাকে কখনো স্ত্রীর মর্যাদা দাওনি।'

'আবার বইয়ের ভাষায় কথা বলা হচ্ছে? বেশ্যা মাগী। মেয়েমানুষকে লাই দিলে এই হয়, পচো এখন তালা বন্ধ ঘরে।'

'আর ওস্তাদজি?' স্বামীর কথা কানে যাচ্ছিলো না নন্দিনীর।

'ওস্তাদজি! আবার ওস্তাদজির কথা!'

'তাঁকে কী করলে? সেই অসুস্থ মানুষটাকে?'

'ওরে বাবা, দঘদে যে বুক ফেটে যাচ্ছে।'

'তাঁর তো কোনো দোষ নেই, তিনি নিষ্পাপ সন্ন্যাসী মানুষ —'

'তা তো বটেই, পরের বৌ ফুসলে ঘরের বার করলে তো তাকে সন্ন্যাসীই বলে।'

'না না, তিনি কিছু করেন নি, সব আমি, সব আমি, সব আমার একার যুদ্ধ। আমি হেরে গেছি, আমাকে তুমি মারো কাটো খুন করো জ্যান্ত কবর দাও, আগুনে পোড়াও কিন্তু তাঁকে ছুঁয়ো না, ভালো হবে না, তোমার ভালো হবে না —' প্রলাপের মতো নবীনের পায়ে মাথা কুটে কুটে বলতে লাগলো সে।

নবীন এক লাথিতে তাকে ছিটকিয়ে দিয়ে দাঁত ঘষে বললো, 'সে হারামজাদাকে আমি কুকুর দিয়ে খাওয়াবো, মরুক, শুয়োরের বাচ্চা মরুক এবার যাবজ্জীবন জেলের অন্ধকারে বেয়োনেটের খোঁচা খেয়ে।'

'কুকী। কুকী বললে?'

'সাত বছর জেল খাটুক তো তারপর দেখা যাবে কী করি।'

'তুমি কুকী বললে! তুমি কুকী বলছো —'

'বাঘের সঙ্গে লড়াই ক'রে কুম্ভীর ছানা তুই জঙ্গলে বাস করবি?'

'আমাকে মেরে ফ্যালো, মেরে ফ্যালো —'

'তা তো ফেলবোই কিন্তু এরকম ক'রে নয়, জ্বালিয়ে-জ্বালিয়ে পুড়িয়ে-পুড়িয়ে।'

'বলো ওস্তাদজি এখন কোথায়?'

'হাজতে।'

'হাজতে!'

'হ্যাঁ গো হাজতে। আমার বে করা বৌ চুরি ক'রে নিয়ে পালিয়েছিলো আর আমি কি তাকে রূপোর পালঙ্কে শুইয়ে সোনার থালায় ভাত খাওয়াবো? ভেবো না, ঐ মাগীরও ভালো বন্দোবস্ত হয়েছে, ওটাকে ঘুষ বাবদ দারোগাবাবুকে দিয়ে দিয়েছি।'

নন্দিনীর চোখ বড়ো বড়ো হ'য়ে গেলো, চুল খুলে গেলো, বুকে হাঁপ ধ'রে নিঃশ্বাস বন্ধ হ'য়ে এলো। সে কাঁদতে পর্যন্ত ভুলে গেলো।

পাগলের মতো হাসতে লাগলো নবীন। সত্যিই তাকে পাগলের মতো দেখাচ্ছিলো। নিজের মহলের চারদিক সে ছিটকিনি দিয়ে বন্ধ ক'রে গিয়েছে। রাত হয়েছে, নিশুতি হ'য়ে এসেছে বাড়িটা। হাত বাড়িয়ে সে ধরতে গেলো নন্দিনীকে। সভয়ে স'রে দাঁড়িয়ে নন্দিনী বললো, 'না।'

'না! না! আচ্ছা—' এক হ্যাঁচকা টানে তাকে নিয়ে এলো কাছে, কর্কশ গলায় বললো, 'স্বামীর শরীরটাকে বড়োই ঘেন্না, না? আর পরপুরুষের সঙ্গে শুয়ে-শুয়ে খুব আরাম লাগছিলো?'

'চুপ!'

'আবার চুপ! আবার চোখ রাঙানী, হারামজাদী—'

'তিনি আমার গুরু, আমার পিতা আমি ঈশ্বরের মতো ভক্তি করি তাঁকে।'

'একেবারে প্রাণেশ্বর! শোন, তুই না জানলেও সবাই জানে নবীনচন্দ্র মিত্র মজুমদারের কতো টাকা মজুত আছে ব্যাঙ্কে। মামলা সাজাতে ক' মিনিট লাগে? টাকা। সব টাকার খেলা। দাঁড়া না শুধু কি তোর প্রাণেশ্বর? তোর উষ্টি গুষ্টী যে যেখানে আছে কী করি সবাইকে।' নন্দিনীর নিঃশ্বাস পড়লো না।

'তিরিশ দিনের যুদ্ধে আমার তিন তিরিক্ষে ন'টি হাজার টাকা খরচ হ'য়ে গেছে' টেনে নন্দিনীর ব্লাউজটা সে ছিঁড়ে দিলো 'শোন মাগী, এখন আর তুই আমার স্ত্রী নোস, স্ত্রীলোক। টাকাটা এবার আমি এভাবেই উশুল কববো?'

নন্দিনীকে সে চটকাতে লাগলো।

'পিশাচ!' একটা কামড় বসিয়ে স'রে গেলো নন্দিনী, খাটের ওপাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে বড়ো বড়ো দম নিতে লাগলো।

চোখ লাল ক'বে নবীন বললো, 'পিশাচ, না? আর ঐ দেড়েলটা ঈশ্বব! ঈশ্ববের সঙ্গে শুতেই সবচেয়ে ভালো? ওটার আছে কী?'

'আবাব!'

নবীন নন্দিনীকে ধরবাব চেষ্টা করলো। খাটটা ঘুরে-ঘুরে যেন খেলা চলতে লাগলো। এক সময়ে নন্দিনী বাঁচবার আর কোনো উপায় না দেখে, কিছু ছুঁড়ে মারবার জন্যে এদিক-ওদিক তাকালো। পেয়েও গেলো হাতের কাছে। পেটমোটা মস্ত শুঁড়, কপাল ভবা সিঁদুর প্রায় সের খানেক ওজনের এক সিদ্ধিদাতা গণেশ। নবীনের ব্যবসায়েব সিদ্ধি।

কবে কোথা থেকে এনে যে সে খাটের পাশে দেয়াল তাক ক'রে রুপোব সিংহাসনে বসিয়ে রেখেছিলো, নন্দিনী জানে না, বিয়ে হ'য়ে থেকেই এই ঠাকুরকে সে এখানে দেখছে। নবীন প্রত্যহই তাকে ফুল বেলপাতা দেয়, কাজে বেরুবার আগে ঘটা ক'রে নমস্কার করে। নবীনের ধারণা এই ঠাকুরই তাকে ভাগ্যের চাবি গুঁজে দিয়েছেন হাতে।

সেই সিদ্ধিদাতা গণেশই যে তাঁর ভক্তির আসন থেকে উঠে এসে নন্দিনীর হাতের অস্ত্র হবে কে ভাবতে পেরেছিলো!

ছুঁড়ে মারতেই ধাঁ ক'রে লাগলো এসে নবীনের কপালে। কোন শিরায় লাগলো কে জানে, রক্ত বেরুলো ফিনকি দিয়ে ফোয়ারার মতো। অতবড়ো জোয়ান মানুষটা তার সকল আসুরিক শক্তি ও

চরিত্র নিয়ে একটা অসহায় বালকের মতো খাটের বাজুতে ধাক্কা খেয়ে ট'লে প'ড়ে গেলো মেঝের উপব।

কতোক্ষণ মূঢ় দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে, নন্দিনী, চিৎকার ক'রে উঠলো 'খুন, খুন, আমি খুন করেছি।'

তাবপর নিজের গলাব শব্দেই নিজে ভয়ঙ্কর চমকে উঠে দৌড়ে বাথরুমেব দবজাব কাছে এলো, সিটকিনি খুললো, পিছন দিক দিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে খিড়কিব দবজা খুলে মিলিযে গেলো অন্ধকারে।

ছুটতে ছুটতে স্ট্যাণ্ডে এসে দেখলো বাত সাড়ে দশটাতেই কাজেব পাট চুকিয়ে দুটো ট্যাক্সী ঝিমুচ্ছে ব'সে ব'সে। ডবল টাকা কবুল ক'রে পাওয়া গেলো একটা। সোজা পিত্রালয়ে এলো সে। মফঃস্বলেব রাত, সবাই শুয়ে পড়েছে, ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে চাবদিকে, ফাঁকে-ফোকবে ডানা ঝাপটাচ্ছে পাখি, দবজায় ত্রস্ত করাঘাত শুনে প্রথমে সন্তোষবাবুই দরজা খুলে দেখতে পেলেন মেয়েকে, আতঙ্কিত গলায বললেন, এ কী! তুই এতো বাতে?'

নন্দিনী ঝড়ের বেগে ঢুকে এলো ঘবে, মা ভূত দেখার মতো চমকে উঠে বললেন, 'কী। কী হয়েছে?'

রুদ্ধশ্বাসে নন্দিনী বললো, 'আমি খুন কবেছি।'

'খুন। কাকে! কাকে!'

'নবীন মজুমদাবকে, মা আমাকে বাঁচাও। বাবা আমাক বাঁচাও।'

মানুষ তাব জীবনকে যে কতো ভালোবাসে এর চেয়ে বড়ো প্রমাণ আর কী আছে? অত তেজ, অত ব্যক্তিত্ব, অত জেদ, পিতা মাতার উপর অত অভিমান সব কোথায় ভেসে গেলো নন্দিনীর। এতোক্ষণ বাদে সে মায়ের বুকে মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগলো উত্তাল হ'য়ে।

সমানে মা-ও কাঁদলেন। কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'তুই কেন ম'রে গেলি না, এর চেয়ে যে মরণও ভালো ছিলো।'

বাবা টুঁ শব্দ করলেন না, সার্ট গায়ে দিলেন, ব্যাগভর্তি টাকা নিলেন, মায়ের বুক থেকে তাকে টেনে নিয়ে বাইরে এলেন,

অপেক্ষমাণ ট্যাক্সীতে উঠে ব'সে বললেন. 'কার্গো স্টেশন নয়, গৌহাটি, গৌহাটি এরোড্রমে চলো।'

উপসংহার

বলা শেষ ক'রে নন্দিনী চুপ করলো। অবশ্য এতোটা সে মুখে বলেনি, বেশীর ভাগটাই মনের মধ্যে ছবি হ'য়ে দেখা দিয়েছে, বলেছে শুধুই সারাংশটাই।

হৃষীকেশ তালুকদার বসে শুনলেন নিঃশব্দে, কিছুক্ষণ নিস্পন্দ হ'য়ে রইলেন তারপর বললেন, 'খুনটা তা হ'লে খুন নয়, তবে আর স্বামীকে দেখলেন কী ক'রে।'

'হ্যাঁ, কিন্তু আমি জানতাম — '

'যাক, একটা জট খুললো।'

'হ্যাঁ, কিন্তু আমি — '

'এবং সবচেয়ে বড়ো জটই ছিলো এটা।'

'হ্যাঁ।'

'তবে আর ভয় কিসের।'

'ভয় নেই! কী বলছেন?'

'ভাবছেন আপনার স্বামী আবার আপনাকে ধ'রে নিয়ে যাবেন?'

'ঠিক তাই।'

'তা হ'লে?'

'আপনার সঙ্গে গাড়ি আছে?'

'আছে।'

'আমাকে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে দেবেন?'

'তারপর?'

'যে কোনো একটা ট্রেনে উঠে বসবো — '

'আবার পালাবেন?'

'হ্যাঁ।'

'পালিয়ে-পালিয়ে ক'দিন আত্মরক্ষা করবেন।'

নন্দিনী হাসলো, 'ঠিক বলেছেন।' তার চোখে জল বেরিয়ে এলো, 'এই আত্মরক্ষার চেয়ে আমার আত্মঘাতী হবার গৌরব অনেক বেশি। এতোদিন কেন সেটা ভাবিনি?'

'আমার সঙ্গে দেখা হবে ব'লে।'

'আপনার সঙ্গে দেখা হবে ব'লে? কী লাভ তাতে?'

'কথাগুলো বলতে পারলেন, হালকা হ'লেন —'

'তা ঠিক।'

'তারপর আত্মঘাতী হওয়া যে এবচেয়ে ভালো সেটা মনে হ'লো।' মৃদু হাসলেন ডক্টর তালুকদার।

নন্দিনী সংশয়ের চোখে তাকালো, ভদ্রলোক কি তাকে ঠাট্টা করছেন?'

'আমি বলি কি শুনুন —'

'বলুন।'

'আপনি বিয়ে করুন না আবার।'

'আমি বিয়ে করবো? আবার!'

'একবার ক'রে ঠকেছেন ব'লে প্রত্যেকবারই ঠকবেন এমন কোনো মানে নেই। সব পুরুষ নিশ্চয়ই এক রকম নয়।'

'এ আলোচনা থাক।' নন্দিনী গম্ভীর হ'লো।

'কেন থাকবে। আমি আজ বহুবছর মাষ্টারি করছি, আপনি আমার ছাত্রীও হ'তে পারতেন, আমার উপদেশ শুনলে আপনার ভালোই হবে।'

'আর ভালো আমি চাই না।' প্রসঙ্গ বদলে নন্দিনী ডক্টর তালুকদারকে বিদায় দেবার ভঙ্গি করলো, 'আপনি এসেছেন, যে কারণেই এসে থাকুন না কেন, আমি খুশি হয়েছি, সম্মানিত হয়েছি, সত্যি বলতে মুনমুনের জন্যও আমার মন কেমন করছিলো —'

'চলুন না, তাকে দেখে আসবেন।' নন্দিনী যে তাঁকে বিদায় দিতে চাইছে এই ইঙ্গিতটা বোধহয় বুঝতে পারলেন না তিনি।

নন্দিনী বললো, 'কী হবে মায়া বাড়িয়ে। আমার নিয়তির সঙ্গে এখনই আমার মোকাবিলা করতে হবে। মাঝখান থেকে আপনাকে বিব্রত করলুম।'

'একটা সিদ্ধান্তেও পৌঁছানো গেলো।'

'একটা সিদ্ধান্তে?'

'আপনি যখন আমাকে বিলিতি মতে পুরোহিতের মর্যাদা দিয়েছেন আমিও অবশ্যই আপনাকে শিষ্যা হিসেবে দেখবো, যা ভালো বুঝি বলবো, মান্য করা না করা আপনার মর্জি।'

'কী আপনার উপদেশ?'

'যদি অন্য স্বামী গ্রহণ না করেন তা হলে এই স্বামীর স্ত্রী হয়েই আপনাকে থাকতে হবে, সেটা তো ঠিক?'

'অন্য স্বামী গ্রহণ না করলেও তো বিচ্ছিন্ন হওয়া যায়। যায় না?'

'তা অবশ্য যায়। বিচ্ছেদের মামলা আনতে হবে। আর ওটা পাওয়া আপনার পক্ষে খুব কঠিনও হবে না। সাত বছর ছেড়ে আছেন।'

'তা হ'লে আমাকে আপনি একটু সাহায্য করবেন এ বিষয়ে?'

'নিশ্চয়ই।'

'আমি কিছুই জানি না। এতো দিন এমন একটা ভুলের মধ্যে থেকে কষ্ট পাচ্ছিলাম! মানুষ যেমনই হোক, কারুকে খুন করার অধিকার তো আমার নেই। অপরাধ অপরাধই।'

'খুব সত্যি!' ডক্টর তালুকদারকে অত্যন্ত স্থির মনে হচ্ছিলো, স্থির গলাতেই বললেন, আর সত্যি যদি খুন হ'য়ে যেতেন ভদ্রলোক আমারও রক্ষা করতে খুব অসুবিধে হ'তো। যাক গে চলুন —'

এবার উঠলেন তিনি। নন্দিনীও উঠলো, পর্দা সরিয়ে বিদায় দিতে দিতে বললো, 'আমি আর যাবো না এখন।'

'কখন যাবেন?'

'বলুন কখন গেলে এ-বিষয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলা যাবে?' যেন আবার একটু সাহস পাচ্ছিলো মনের মধ্যে।

হৃষীকেশ বললেন, 'আমার এখন গেলেই সুবিধে। আর কোনো বিপদের মধ্যেও আপনাকে একা রেখে যেতে চাই না। এমনও তো হ'তে পারে, আপনার বাসটা না হয় উনি না-ই ধরতে পারলেন, একটা ট্যাক্সী ধরতে বাঁধা কী? সেটা নিয়ে ফলো ক'রে থাকলে আপনার স্টপ্‌টা দূর থেকে হ'লেও উনি হয়তো দেখে থাকবেন। তারপর গলিতে ঢুকে নাম ধাম জিজ্ঞেস ক'রে চ'লে আসবেন। পুলিশও আনতে পারেন। হাজার হোক আপনি এখনো তাঁর স্ত্রী।'

'তাই তো।' নন্দিনীর মুখে আবার ছায়া নিবিড় হ'লো।

'ঝামেলায় দরকার কী। আমার সঙ্গে চলুন, সে সব ঝঞ্ঝাটও এড়াতে পারবেন, আর কী ভাবে এগুলে আর আপনাকে এই সংকটের মুখোমুখি হ'তে হবে না তারও একটা বন্দোবস্ত করা যাবে।'

'অজস্র ধন্যবাদ। আমি যে কী ব'লে আমার কৃতজ্ঞতা জানাবো—'

'কিছু দরকার নেই, কৃতজ্ঞতা সময় মতো উকিলকে জানালেই হবে।'

দরজায় তালা বন্ধ ক'রে এবার নন্দিনী ঋষীকেশ তালুকদারের সঙ্গে নেমে এলো নীচে। গাড়ীতে উঠে বসলো।

বিকেল ঘন হ'য়ে এসেছে, সরু গলি ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। সবাই উনুনে আঁচ দিয়েছে রাস্তার উপর। ধোপার দোকান, দর্জির দোকান, মিষ্টির দোকান, ইলেকট্রিকের দোকান, এই সব ছোটো ছোটো দোকান নিয়েই এই সস্তা গলি। গাড়ি গলি ছাড়িয়ে বড়ো রাস্তায় এলো। দপ ক'রে এক সঙ্গে জ্বলে উঠলো সব আলো। ঝলমল ক'রে উঠলো শহর।

গাড়ি চালাতে চালাতে হৃষীকেশ বললেন, 'একটা প্রস্তাব আছে।'

নন্দিনী জানালার বাইরে থেকে চোখ সরিয়ে এনে বললো, 'বলুন।'

'আমি যদি আপনার প্রার্থী হই, আপনি রাজি আছেন?'

'কী!'

'আপত্তি থাকলে কোনো সঙ্কোচ করবেন না, সম্মতি থাকলেও দ্বিধা করবেন না জানাতে, কেননা আমরা তো কেউ ছেলেমানুষ নই?'

'আপনি মহৎ, আপনার দয়া অতুলনীয়। কিন্তু আমারও তো একটা বিবেচনা আছে?' কোথায় যেন আত্মসম্মানে ঘা লাগলো নন্দিনীর।

হৃষীকেশ বললেন, 'কিসের বিবেচনা।'

'নিজের ভার অন্যের উপর চাপানো কোনো ক্ষেত্রেই সমর্থনযোগ্য নয়।'

'ভার তো নয়, দয়াও নয়।'

'তবে?'

'প্রেম। ভালোবাসা।'

'প্রেম! ভালোবাসা?'

'আমরা সব সময়ে সব কথা বুঝি না, জানি না, একটা অবুঝ বেদনা নিয়ে ঘুরপাক খাই। এতোদিন আমিও তাই করছিলাম। মুনমুনের জন্য নয়, আমি নিজের জন্যই এই রোদে কলেজ থেকে বেরিয়ে চলে এসেছিলাম এখানে। অর্থাৎ আমার মনই আপনাকে চাইছিলো। বিশ্বাস করুন, আমি যখন আপনার দরজায় টোকা দিলুম তখনো সে কথা জানতাম না, আপনি দরজা খুলে দিয়ে আমাকে ঘরে নিয়ে আসতেই আমার অবচেতন থেকে সেই সত্য লাফিয়ে উঠে এলো চেতনায়, আমি আর আপনাকে ছেড়ে উঠে আসতে পারছিলাম না, নইলে অতক্ষণ ওখানে ব'সে থাকা নিশ্চয়ই আমার পক্ষে সম্ভব হ'তো না, স্বাভাবিকও নয়।'

নন্দিনী চুপ ক'রে রইলো।

'অবশ্য এর সঙ্গে আপনাকে আপনার বিচ্ছেদের মামলায় সাহায্য করা না করার কোনো সম্পর্ক নেই—' একটা গাড়ির সঙ্গে প্রায় ধাক্কা লাগতে লাগতে সামলে নিলেন হৃষীকেশ, 'আমি আমার কথাটা জানিয়ে রাখলাম, এই পর্যন্ত।'

নন্দিনী এবারও কোনো জবাব দিলো না।

হৃষীকেশও এরপরে আর কিছু বললেন না। বাড়ি এসে উৎসাহের গলায় ডাকলেন, 'মুনমুন, ছাখো, কাকে নিয়ে এসেছি।'

মুনমুনের বদলে মুনমুনের পিয়ানোর টিচার এসে হাজির হ'লো।

নন্দিনীকে দেখে একটু থমকে গিয়ে সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রে হৃষীকেশের দিকে তাকিয়ে বললো, 'তোমার ফিরতে এতো দেরি?'

হৃষীকেশ বললেন, 'একটু দেরিই হ'য়ে গেছে, না?'

'ওঃ তোমার মেয়ে! হোপলেস। কতো কাণ্ড ক'রে তবে আয়ার পার্কে পাঠিয়েছি।'

'তুমি যা করছো তার তুলনা হয় না, কিন্তু আর তোমাকে কষ্ট করতে হবে না, আসল লোককে আমি ধ'রে নিয়ে এসেছি।'

নন্দিনী হাত বাড়িয়ে বললো, 'আপনি ভালো আছেন?'

এমিলি জবাব দিলো না। হ্যাণ্ডসেকও করলো না।

আজ আর এই অপমান গায়ে মাখলো না নন্দিনী। হাত গুটিয়ে নিয়ে ধীরে ধীরে চলে এলো ভিতরে।

নিজের নির্দিষ্ট ঘরের জানালায় এসে দাঁড়ালো চুপচাপ। দাঁড়িয়েই ছিলো, খানিকক্ষণ পরে হৃষীকেশ এলেন। ব্যস্ত সমস্ত হ'য়ে বললেন, 'কী কাণ্ড, আমি ভুলেই গিয়েছিলুম আপনার আজ সারাদিন খাওয়া হয়নি। ছি ছি, আবার হরিচরণকেও মেয়েকে ডাকতে পার্কে পাঠালাম —'

নন্দিনী ফিরে দাঁড়ালো, মৃদু হাস্যে বললো, 'আমিও ভুলে গিয়েছিলুম। আমার খিদে পায়নি।'

'কিন্তু আমার পেয়েছে; চলুন পার্ক থেকে মুনমুনকে তুলে নিয়ে কোনো রেস্তোরাঁয় যাই।'

'আমি তো খাবার ক'রে দিতে পারি। আমি তো জানি কোথায় কী আছে।'

'কিন্তু একে তো এড়ানো যাচ্ছে না।'

'কাকে?'

'আমি খুব দুঃখিত, খুব লজ্জিত —'

'কেন?'

'মেয়েটি দেখুন নিজে নিজেই কর্তা হ'য়ে বসেছে বাড়ির। কী বিশ্রী ব্যবহার করলো আপনার সঙ্গে কিন্তু আমার তো কিছু করবার

নেই, ছাড়িয়েও দিতে পারছিলাম না আপনি ছিলেন না ক
যদ্দিন না যায়। অন্য কাউকে না পাওয়া পর্যন্ত অন্তত ক'টা
যদি আপনি থাকেন তা হ'লে—'

'আর আমি কোথায় যাবো?' চোখ তুলে তাকালো নন্দিনী, 'এমন মানুষ তো আমি কখনো দেখিনি, আর তো আমি তাঁকে ছাড়া কখনো কারোকে ভালোবাসিনি, এই আমার প্রথম। এমিলির জন্য নয়, মাইনের জন্যে নয়, আপনার জন্যেই আমি এ-কাজ ছাড়তে হয়েছিলাম। আমার দুর্বলতা আমি স্বীকার করতে চাইনি, কিন্তু তা জানতাম, আমি বুঝেছিলাম।'

এই সরল স্বীকৃতিতে হৃষীকেশ মুগ্ধ হলেন। রোমাঞ্চিত হলেন কাছে এসে দাঁড়িয়ে সস্নেহে হাত রাখলেন কাঁধে, বললেন, 'আমার অপেক্ষা সার্থক হ'লো। কতো ভাগ্যে আমি তোমাকে পেলাম নিচু হ'য়ে চুম্বন করলেন তিনি। বুকটা ফেটে গেলো নন্দিনীর। জানতো আনন্দ এমন তীব্র হয়। তবে কি এরই নাম ব্রহ্মানন্দ!